
DIPSHIKHA LIBRARY
ESTD:-1948.
Dist. HOWRAH.
Vill.- KASTOSANGRAH

পঞ্চাশের মন্বন্তর

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীমনোজ বসু

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ পৌষ—১৩৫০ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ—১৩৫১ বঙ্গাব্দ

মূল্য—দুই টাকা

শ্রীপতি প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস

১৪, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর একান্ত আগ্রহে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' প্রকাশিত হইল।

শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টি লইয়া এ বই লেখা নয়। মন্বন্তর সম্পর্কে ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্যত্র অনেকগুলি বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। নিতান্ত কাজের প্রয়োজনে কয়েকটি বিবৃতিও দিয়াছি। সেগুলির মর্মানুবাদ বইয়ে দেওয়া হইয়াছে। শ্মশানের ভয়াবহতার মধ্যে দুর্গতের আর্তধ্বনি শুনিতে শুনিতে যাহা লিখিয়াছি ও বলিয়াছি তাহাই যে বইয়ের আকারে বাহির হইবে, কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও ইহা কল্পনার অতীত ছিল।

একই বিষয় লইয়া বহু স্থানে বলিতে হইয়াছে, তাই অনেক পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। বক্তৃতায় যাহা বলিতে পারিয়াছিলাম, পরাধীন দেশের অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহার অনেক কথাই ছাপা যায় নাই; সেজন্য কোথাও কোথাও ভাবের অসঙ্গতি ঘটিতে পারে। অনুবাদে ভাষার স্বচ্ছন্দতাও হয়তো কোন কোন স্থানে নষ্ট হইয়াছে।

তবু ইহার মধ্যে কতকগুলি মর্মান্তিক সত্যের উদ্ঘাটন হইয়াছে। কর্মক্ষেত্রে সহস্র সহস্র দুঃখী দেশবাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া এইসব সত্যের উপলব্ধি করিয়াছি। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলি একত্র সংগ্রথিত হইলে আমাদের অসহায় অবস্থা বুঝিবার সুবিধা হইবে। এইজন্যই উদ্যোক্তা-দের আমি বাধা দিই নাই।

আরও একটি কারণ আছে। মন্বন্তর সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে বহু রহস্য প্রকাশ পাইবে; এইরূপ

দুর্দৈব যাহাতে আর ঘটিতে না পারে, দেশবাসী সে বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক হইতে পারিবেন। যাঁহাদের শক্তি ও অবসর আছে, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দল আমাদের কার্যকলাপের অবিরত বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুর্গতের সেবা-প্রচেষ্টার মধ্যেও রাজনীতিক অভিসন্ধি আরোপিত হইয়াছে। যে মানসিকতা চরমতম দুঃসময়েও কুৎসা রচনা করিয়াছে ও বারম্বার অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়াও লজ্জা বোধ করে নাই, উত্তর দিতে গেলে তাহার সম্মাননা করা হয়। দুর্গতির তুলনায় আমরা নিতান্ত সীমাবদ্ধ আয়োজন লইয়াই কাজ আরম্ভ করি। প্রাণপাত চেষ্টায় সাহায্য-ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহার শতগুণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটা কাজ হইয়াছে—পর্বতপ্রমাণ দুষ্কৃতি ও নিষ্ক্রিয়তা গোপন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আমরা উহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি। মানুষ মারা গিয়াছে; কিন্তু মুমূর্ষুর আর্তনাদ প্রদেশের গণ্ডীর মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই—সমুদ্রপার হইয়া দেশ-দেশান্তর অবধি পৌঁছিয়া গিয়াছে।

আমার লেখা ও বক্তৃতায় যদি কেহ আহত হইয়া থাকেন, আমি নিরুপায়। যাঁহাদের হঠকারিতায় আমার দেশবাসীর এই সীমাহীন দুর্গতি, কোন কারণেই আমরা তাঁহাদের ক্ষমা করিতে পারি না। ইতিহাস চিরকাল তাঁহাদিগকে কলঙ্কলিপ্ত করিয়া দেখাইবে, মুখের ভাষায় আমরা তাঁহাদের কি শাস্তি দিতে পারিয়াছি?

করাল মন্বন্তরের মধ্যে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি ও নীচাশয়তা দেখিয়াছি, তেমনই আবার মানুষের উদার মহানুভবতায় বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাইয়াছিলাম। যাঁহারা

ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, অবস্থা লঘু করিয়া দেখাইয়া ও অভিসন্ধির আরোপ করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে সাহায্য-চেষ্টা ব্যাহতই করিতেছিলেন। ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহির হইতে অজস্র সাহায্য আসিয়াছে। আর্ত মানুষকে বাঁচাইবার আগ্রহে প্রাদেশিকতার বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

সহস্র সহস্র দাতার এই অখণ্ড বিশ্বাস ও প্রীতি-ধারায় আমরা অভিভূত হইয়াছি। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা রিলিফ কমিটীর সঙ্গে আমি নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান যাহা করিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। শত শত সেবক সেবাকর্মে অহোরাত্র শ্রম করিয়াছেন। বিরুদ্ধ-বাদীরা ভ্রূকুটি করুন, কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে দেশবাসী আর একবার সংহতি ও অপরিমেয় সেবাবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু দুর্গতের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়াই একমাত্র বা প্রধানতম কাজ নয়। মন্বন্তরে মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়াছে; জীবন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বনিয়াদ উল্টাইয়া গিয়াছে। বাঙালি পরপ্রত্যাশী ভিখারির জাতি হইতে চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যাঁহারা অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া কথিত, তাঁহাদের অবস্থাই সকলের চেয়ে মর্মস্পর্শী। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর—বিশেষ করিয়া এই দুই শ্রেণীর—হৃতমর্যাদা উদ্ধার করিয়া সকলকে সমাজ-জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা এখন আমাদের বৃহত্তম কর্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে মাসের পর মাস ধরিয়া কি শোচনীয় দৃশ্য চোখের উপর দেখিলাম! এমন যে সত্যই ঘটিতে পারে, ভাবী-যুগের মানুষ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এখন মাঠের ফসল

ঘরে উঠিতেছে। অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দেখা না দিলে হয়তো সুদিন ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ আনন্দোচ্ছল শান্ত সংসার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, নিরপরাধ নরনারীর দল অনাহারে তিলে তিলে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে—তাহাদের অসহায় ধ্বংস-দৃশ্য চিরজীবন আমাদের বিভীষিকা হইয়া থাকিবে।

৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা
১লা পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে প্রকাশকের নিবেদন

'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' প্রথম সংস্করণ তিন সপ্তাহে নিঃশেষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার সম্পর্কে গ্রন্থকার দ্বিধা করিতেছিলেন; যাঁহাদের শক্তি ও অবসর আছে তাঁহারাই এ সম্বন্ধে তথ্যবহুল প্রামাণিক বই লিখিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু শত শত ব্যক্তি বই না পাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, অজস্র চিঠি আসিয়া জমিয়াছে। দেশবাসীর এইরূপ আগ্রহাতিশয্যে নূতন সংস্করণ বাহির হইল।

এই সংস্করণে দুইটি নূতন প্রসঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। একটি জানুয়ারিতে ও একটি মার্চ মাসে রচিত। ইহা হইতে মন্বন্তরের সাম্প্রতিক অবস্থা জানা যাইবে।

আট খানি দুর্ভিক্ষের ছবি দেওয়া হইল। সর্বশেষ খানি মাণিকগঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিলা সংঘের তোলা। বাকি ছবিগুলি ইন্টার-ন্যাশন্যাল ফোটো নিউজ (১৫।৩ চৌরঙ্গি রোড, কলিকাতা) সরবরাহ করিয়াছেন। প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তী। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বহু দুর্গত রাজবন্দী পরীক্ষার ফী যোগাড় করিতে পারিতেছিলেন না; প্রথম সংস্করণের সমুদয় লভ্যাংশে তাঁহাদের ফী দেওয়া হইয়াছে।

১লা বৈশাখ
১৩৫১ বঙ্গাব্দ

শ্রীপ্রকাশক



ঘর-গৃহস্থালী লজ্জা-সঙ্কোচ সমস্ত গিয়াছে, চাষা-মাতা কলিকাতার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুষ্ক বুকে একফোঁটা দুধ নাই, সন্তানকে কে বাঁচাইবে?



এই মানুষ শত্রুর সামনে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে পারিত ; ভাবী বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিত এই শিশু !

এক মুঠা ভাতের জন্য রাস্তায় পড়িয়া মানুষ মরিতেছে। সভ্যতা গর্বী কলিকাতা শহর !





সুপ্রকাশ্য হ্যারিসন রোডের উপর :

মানুষ গোরুর সঙ্গে ডাষ্টবিনের আবর্জনা খাইতেছে।



ছেলের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া মা তাহাকে জীবন্ত কবর দিতেছিলেন। মাথাটি কেবল ঢাকা পড়ে নাই, এমনি সময়ে ইস্কুলের ছেলেরা আসিয়া উদ্ধার করে। ছেলেটি কাঁথা হিন্দুমিশনের আশ্রয়ে আছে।



আমেরি সাহেবের মতে, অতি-ভোজনের জন্যই নাকি বাংলার খাদ্য সঙ্কট।



তমলুকের প্রান্তে :
কুকুরে মৃতদেহ খাইতেছে।



বাঁ-হাত, বুকের বামদিকটা ও পাঁজর শিয়ালে খাইয়া গিয়াছে। মেয়েটির নাম মোক্ষদা ; বানিয়াজুড়ি

পঞ্চাশের মন্বন্তর



'অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনারূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়,—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল, "চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল সে সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিল। তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ ও ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।"...এই বলিয়া সেই বিশীর্ণ দেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।' —আনন্দমঠ

পঞ্চাশের মন্বন্তর

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি বাঙালি ভুলিতে পারে নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরও বাংলার ইতিহাস চিরদিন মসীচিহ্নিত করিয়া রাখিবে।

১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লইলেন। দেশে তখন যে অবস্থা চলিতেছিল, তাহা অরাজকতারই নামান্তর। নানা কর্তা—অসংখ্য শাসন-বিধি। শোষণ পুরাদস্তুর তো চলিতেই ছিল, তাহার উপর অনাবৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টির দরুন অজন্মা ও শস্যহানি ঘটিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল মন্বন্তর (১৭৭০ অব্দ)। দেশ শ্মশান হইয়া গেল। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কতকটা কৈফিয়ৎ চলিতে পারে,—ইংরেজ যে শাসন-মহিমার জগৎময় ঢক্কা পিটাইয়া থাকে, মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে উহা তখনও দৃঢ়মূল হইবার অবকাশ পায় নাই।

কিন্তু ১৯৪৩ অব্দে এরূপ কোন কৈফিয়ৎ চলিতে পারে না। পৌনে দুই শত বৎসরের অধিককাল দোর্দণ্ড প্রতাপে শ্বেত-রাজত্ব চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দী অজস্র সুযোগ-সুবিধা মানুষের হাতে আনিয়া দিয়াছে; বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। এখনও দুধের অভাবে কত ছেলে মায়ের কোলে মরিয়া গেল, ডাস্টবিনে মানুষ পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া উচ্ছিষ্ট খাইল, এ দৃশ্য মাসের পর মাস আমরা চোখে দেখিয়াছি।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের বারোটি কারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

(১) ১৯৪২ অব্দে আউশ ফসল ভাল হয় নাই।

(২) ১৯৪২-৪৩ অব্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে।

(৩) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন কম হইয়াছে।

(৪) কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে।

(৫) সরকারের নৌকা-নিয়ন্ত্রণ নীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

(৬) সমুদ্রকূল হইতে লোক-অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

(৭) ব্রহ্ম ও আরাকান হইতে আগত আশ্রয়ার্থীরা ভিড় জমাইয়াছে।

(৮) শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িয়াছে।

(৯) ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ঘাটতি-পূরণের উপায় হয় নাই।

(১০) অনেক বিমানঘাটি তৈয়ারি হওয়ায় সেই সব জায়গায় চাষ হইতে পারে নাই।

(১১) সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার বেশি খরচ হইয়াছে।

(১২) অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর (১৯৪৩) পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে এক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। সরবরাহ-সচিবের বারো দফার মধ্যে ইহার উল্লেখ মাত্র নাই। স্পষ্টত তিনি গৌণ কারণগুলির উপর জোর দিয়া আসল ব্যাপার চাপিয়া গিয়াছেন। সরকার-পক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিষের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগজি-নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন। যাহারা সরকারি কাজ করে, যুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, কলকারখানায় নানাবিধ যুদ্ধদ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি-নোট অজস্র পরিমাণে পাইল; তাহা দিয়া মহাস্ফূর্তিতে জিনিষপত্র

কিনিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ লোকই ইহার অনেক পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে; ফাঁপানো-মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিষপত্র তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিতে লাগিল। ফাঁপানো-মুদ্রানীতির জন্য ভারত-সরকার তথা ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্র দায়ী। এই বিষয়ে খুলিয়া বলিলে সাহস ও সত্যভাষণের জন্য সরবরাহ-সচিবকে প্রশংসা করা যাইত।

পার্লামেণ্টের বিতর্ক-সভায় মিঃ পেথিক লরেন্স কয়েকটি খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন। 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহা কিনিবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নাই। মুদ্রাস্ফীতিই এই অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয়—একমাত্র ভারত-গবর্নমেণ্টই দায়ী।' মিঃ আমেরিও আমতা-আমতা করিয়া ইহাতে একরকম সায় দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সমস্যাটি হইতেছে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। জনসাধারণের হাতে কিনিবার মতো টাকা ছিল না, ইহা ঠিক। তাহা হইলে অবস্থাটা আজিকার মতো এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত না।'

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। টাকা থাকিলেই হয় না। অনেকে দিন আনিত, দিন খাইত; জিনিষের ক্রম-বর্ধমান দামের সহিত তাহাদের সঙ্গতি তাল রাখিতে পারিল না। নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া এমন অবস্থার লোক প্রভূত পরিমাণে মরিয়াছে। অথচ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছুই হয় নাই; অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গেলে তবে কর্তাদের কিছু টনক নড়িয়াছে।

সরবরাহ-সচিবের হিসাবে অপচয়ের কথাটাও নাই। কৃষক, মধ্যবিত্ত-ক্রেতা, দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আস্ফালন চলিয়াছে;

মিঃ আমেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাজারের সব চেয়ে বড় ক্রেতা সরকার; সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিক ও ধনিক-সম্প্রদায়। মজুত খাদ্যের মধ্যে কত যে অপচয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কে দিবে? ব্রহ্ম-সীমান্তের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অপরিমেয় আহার্য নষ্ট হইয়াছে। ভারত-সরকারের সঞ্চিত আটা ময়দা ছোলা ছাতু প্রভৃতির কি পরিমাণ অপচয় হইয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব পাইলে বর্তমান দুর্ভিক্ষের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। কলিকাতায় এ. আর. পি. র আনুকূল্যে শত্রু-বিড়ম্বিতদের জন্য যে সামান্য পরিমাণ জিনিষ মজুত করা হইয়াছিল—তাহাতেও প্রচুর অপচয় ঘটিয়াছিল, এ তথ্য সকলের জানা আছে।

দুর্ভিক্ষ একদিনে আসে নাই। সরবরাহ-সচিবের উল্লিখিত বারো দফার কারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, করাল মন্বন্তর ধীরে ধীরে বাংলাকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার প্রতিকার-চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার শোচনীয় ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। দেশ-বিদেশের সৈন্য দলে দলে আসিয়া বাংলাদেশ ভরিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র শত্রুকে বন্দী করিয়া আনা হইল—তাঁহাদের অনেকের বোঝা বাংলার কাঁধে চাপিল, ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য আশ্রয়ার্থী আসিয়া জুটিল, কলকারখানায় ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংখ্যাতীত মজুর আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখনও মনে করিতেছেন বাংলাদেশ অবাধে সকলের অন্ন যোগাইয়া যাইবে, কোন প্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

সৈন্যদের খাদ্য সাধারণ বরাদ্দ হইতে অনেক বেশি। শুধু চাউল নয়—ফলমূল তরি-তরকারি মাছ-ডিম-মাংস প্রভৃতিও তাহাদের জন্য

প্রচুর পরিমাণে ক্রীত হয়। ঐ সব জিনিষ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় চাউলের উপর টান বাড়িয়া গেল। ইহার উপর সরকার আবার সৈন্য-দলের জন্য দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সর্বদাই মজুত রাখিতে লাগিলেন। বড় বড় কারখানার মালিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হইয়া মজুর ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্যতের খাদ্য-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সরকার পরোক্ষে ইহাদের সহায়তা করিলেন। জনসাধারণের কথা কেহ ভাবিল না।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো হইল। ধান সরাইলেই তো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা ঐ সঙ্গে লোপ পায় না! খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল। ইহার উপর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণকে আরও ভীতিগ্রস্ত করা হইল। এরূপ ক্ষেত্রে লোকের মনে ভরসা জাগাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করা উচিত। সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিলেন যে সাধারণে সরকারের উপর ক্রমশ আস্থা হারাইয়া ফেলিল। মন্বন্তর দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বর্ণনায় সাহিত্যিক-সুলভ অতিশয়োক্তি কিছুমাত্র নাই। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে একটি দুর্ভিক্ষ-কমিশন বসে। কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আনন্দমঠের বর্ণনা তাহার কোন কোন অংশের হুবহু বাংলা অনুবাদ। আনন্দমঠের চিত্রের সঙ্গে আজিকার দুরবস্থা মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের পরেও দুর্ভিক্ষ অনেকবার হইয়াছে *। ইহার

* যথা:—১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৮৪-৮৫, ১৮৯১-৯২, ১৮৯৭ ১৯০০ ইত্যাদি।

মধ্যে ১৮৭৩-৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে দুই কোটি লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দ্রুততার সহিত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়; তাই সেবার লোকক্ষয় সামান্যই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-দমনে এই একবার মাত্র সরকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ৭৩-৭৪ অব্দের ব্যবস্থা এবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। বরঞ্চ ১৭৭০, ১৭৮৩ ও ১৮৬৬ অব্দে যে অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার ফলে অবস্থা ভয়াবহ হইয়াছিল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে অবিকল তাহাই দেখা যাইতেছে। আজিকার মতো তখন অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক ছিল না, কিন্তু এই একটি বিষয় ছাড়া সকল পারিপার্শ্বিকতা আশ্চর্যরূপ মিলিয়া যায়।

১৭৭০ খৃস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল, কর্তৃপক্ষ অমনি 'সৈন্যমণ্ডলীর ছয়মাসের খোরাকি কিনিয়া গুদামজাত করিবার মতলব করিলেন।' অক্টোবর মাস হইতে দেশে হাহাকার উঠিল; নবেম্বর মাসে 'যাহার দুই এক কাহন হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন।' এই নবেম্বর মাসেই 'কালেক্টর-জেনারেল আশঙ্কা করিলেন, দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।'

১৯৪৩ অব্দের অবস্থা অনুরূপ নয় কি? সরকারি ভাষাই উদ্ধৃত করিতেছি—'দেশরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে সৈন্য-বিভাগের তরফ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-ক্রয় হইল। তাহা ছাড়া 'জরুরি অবস্থার প্রতিষেধ হিসাবেও খাদ্য-ক্রয় করিতে হইয়াছে।'

তখনকার দিনে এই চাউল-মজুতের ব্যাপারে এলাহাবাদ ও ফৈজাবাদের বৃটিশ অফিসারের নিকট কোম্পানি চাউল কিনিতে পারেন নাই। এবারেও দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশ হইতে—বিশেষত লাট-শাসিত প্রদেশগুলি হইতে চাউল কিনিতে গিয়া বাংলা-সরকার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের আমলে সন্দেহ করা হইয়াছে, 'ব্যক্তিগত লাভের কারবার খুব চলিয়াছিল।' কোম্পানির কর্মচারিরা এমন অবস্থা করিয়া তুলিল যে বাজারে চাউল পাইবার উপায় রহিল না। দেশে হাহাকার উঠিল; প্রতিবাদ উঠিতে লাগিল। এমন কি কোম্পানির ডিরেক্টররাও কর্মচারীদের অপকর্ম ও অর্থগৃধ্নুতার অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই।

১৯৪৩ অব্দেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। চারিদিকে প্রচুর কলরব উঠিলে মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিলেন, অন্য প্রদেশের চাউল বাংলায় বেচিয়া গবর্ণমেন্টের লাভ হইয়াছে বটে, তবে সেটা গোড়ার দিকটায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখনকার দিনেও অধিক পরিমাণে মাল কেনা ও মজুত করার বিরুদ্ধে হুকুম জারি হইয়াছিল। অন্নাভাবে মানুষ মরিতেছে, তবু অবাধ-রপ্তানি চলিতেছিল। জর্জ টমসনের মতে, 'দুর্ভিক্ষের সময়ে রপ্তানিটা যদি বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে চাউলে কুলাইয়া যাইত—অনাহারে মানুষ মরিত না।' এই রপ্তানি কবে শুরু হইয়াছিল জানা যায় নাই; ১৪ই নবেম্বর (১৭৭০) অনেক চেষ্টার পর রপ্তানি বন্ধ করা হয়, ইতিহাসে এই বিবরণ রহিয়াছে।

এবারেও রপ্তানির বিরুদ্ধে অনেক চেঁচামেচি হইয়াছিল; কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্বে ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে রপ্তানি কতক পরিমাণে বন্ধ হইল, একেবারে বন্ধ হয় নাই। এখনও কয়েকটি ব্যাপারে বিদেশে চাউল রপ্তানি হইতে পারিবে, তবে সরকারি হিসাবে উহা মাসিক এক হাজার টনের অধিক হইবে না। সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের যেসব কারণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই রপ্তানি-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নাই।

বাংলাদেশ ১৭৭০ অব্দের ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারে নাই; অভাব লাগিয়াই ছিল। ১৭৮৩ অব্দে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এইবার কর্তৃপক্ষ একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন, জলপথে রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। একটি কমিটি তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর দণ্ডমুণ্ডের চরম ক্ষমতা দেওয়া হইল। নির্দেশ দেওয়া হইল, যদি কোন ব্যবসাদার খাদ্যশস্য গোপনে মজুত করিয়া রাখে, বাজারে আনিয়া ন্যায্য মূল্যে বেচিতে অস্বীকার করে—তবে তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া তো হইবেই, অধিকন্তু তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিবদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরেও এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফল কি হইয়াছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়া তাহা দেখাইয়া গেল। সরকারি আদেশ অবাধে এবং প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে। সরকারও আদেশের পর আদেশ সংশোধন করিয়া চলিয়াছিলেন।

১৭৮৩ অব্দের দুর্ভিক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইয়াছিল, বাংলা ও বিহার এই দুই প্রদেশের জন্য একটি কায়েমি শস্যাগার তৈয়ারি করিতে হইবে। তদনুযায়ী পাটনায় পাকা-গাঁথনির এক প্রকাণ্ড গোলাঘর নির্মিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা আছে—For the perpetual prevention of famines in India. কিন্তু গোলাঘর চিরদিনই শূন্য রহিয়া গেল, কোনদিন একমুঠা ধান তাহার মধ্যে পড়ে নাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়েও ফুড গ্রেইনস্ কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন, একটা কেন্দ্রীয় শস্যাগার তৈয়ারি করিতে। এই শস্যাগারের জন্য পাকা ইমারত তৈয়ারি হইবে কিনা, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাতে কি পরিমাণ শস্য উঠিবে, তাহা দেখিবার বিষয়।

১৮৬৬ অব্দে যে মন্বন্তর ঘটে, উহাকে সাধারণত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বলা হয়। 'সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সমুদ্রে' সমগ্র উড়িষ্যা পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উহার ঢেউ আসিয়াছিল। এই মন্বন্তরের কবলে উড়িষ্যার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, আজ বাংলার অবস্থাও অবিকল সেইরূপ। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন অগণিত অন্নহীন মারা পড়িতেছে, শিয়াল-কুকুরে মানুষের শব ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে। সরবরাহ-সচিব অবশ্য বলিতে চাহিয়াছেন, বাংলার সমস্ত অঞ্চল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ধাপ্পা দিয়া সত্যকে চাপা দেওয়া যায় নাই। ১৮৬৬ অব্দের মন্বন্তরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। যদি কোনদিন ১৯৪৩ অব্দের নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ বাহির হয়, দেখা যাইবে সেবারের লোকক্ষয় পূর্ববর্তী সকল মন্বন্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে বিভিন্ন জেলার কালেক্টররা আংশিক অজন্মা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন। কিছু খাজনা মকুব করিবারও কথা হইল। কিন্তু কমিশনারেরা উহা সমর্থন করিলেন না। রেভেনিউ-বোর্ডও এইরূপ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করিয়া দিলেন। বোর্ড এক বিস্তৃত বিবরণীতে বাংলা-সরকারকে জানাইলেন, ফসল কিছু কম হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাতে ভাবনার কিছু নাই; এই ফসলেই লোকের খাবার কুলাইয়া যাইবে। আগামী বৎসরের জন্য মজুত অবশ্য কম থাকিবে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

১৯৪৩ অব্দেও সেই অবস্থা। ব্রহ্মদেশ বেহাত হইয়া যাইবার পর কথা উঠিল, বৎসরের শেষের দিকে বাংলায় অন্নাভাব ঘটিতে পারে। কথাটা তুলিলেন, ভারত-সরকারের খুব মোটা মাহিনার এক কর্মচারী। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল,

একটা লোকের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় হতভাগ্য ঘাস খাইয়াছে, হজম করিতে পারে নাই। কিন্তু উহারই এক সপ্তাহ পরে (৭ই মে) সরবরাহ-সচিব বলিলেন, 'সঙ্কটের সমাধান অদূরবর্তী'। পরদিন ৮ই মে বলিলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে বাংলায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে'। তখনকার খাদ্য-বিভাগের বড়কর্তা মেজর জেনারল উড ১৩ই মে বিস্তর অঙ্ক করিয়া দেখাইলেন, বাংলায় কোন অভাব নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব মাননীয় আজিজুল হক ১৫ই মে কৃষ্ণনগরে বলিলেন, 'বাংলায় এখনও চাউলের কমতি হয় নাই'। ৩০শে তারিখেও 'বাংলায় অপ্রচুর খাদ্য রহিয়াছে অথবা আমদানি অপ্রচুর হইতেছে'—একথা সুরাবর্দি সাহেব বলিতে পারেন নাই।

১৮৬৬ অব্দে তখনকার লাট স্যর সিসিল বীডনের গবর্নমেণ্ট বলিয়াছিলেন, দেশে প্রকৃত অন্নাভাব হয় নাই; ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য রহিয়াছে, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তাহারা মজুত করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলা-সরকারও বলিলেন, 'বাংলায় যে পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে তদনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি অসঙ্গত হইয়াছে। মজুত মাল বাজারে বাহির করিতে পারিলেই সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে।'

১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসেই চাউল-আমদানির দাবি উঠিয়াছিল। তখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া লোকে ইতস্তত ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, স্থানে স্থানে খাদ্য লুঠ হইতেছে। কিন্তু সরকার প্রত্যাসন্ন সঙ্কট উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ২৮শে মার্চ স্যর আর্থার কটন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরকারকে অবহিত হইতে বলিলেন। এপ্রিল মাসে কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রেভেনিউ-বোর্ডের তখনও সন্দেহ, সত্যই খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে কিনা। ক্রমে চাউল একেবারে অমিল হইয়া গেল। সৈন্য,সরকারি চাকুরিয়া এবং কয়েদিদের জন্যও চাউল

মিলে না। তখন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্নর বাহির হইতে চাউল আমদানির হুকুম দিলেন। সরকারের অকর্মণ্যতায় এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা যায়। এইজন্য দুর্ভিক্ষ-কমিশন রেভেনিউ-বোর্ডকে খুব দোষ দিল। ১৮৬৭ অব্দের ১১ই আগস্ট রেভেনিউ-বোর্ড অজস্র ক্রটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'সময় মতো কাজে হাত না দেওয়ায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়ায় দুর্দৈব ঘটিয়াছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে আনাড়ি লোক ছিল, দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়াও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। কাজে নামিতে অনেক দেরি হইয়া যাওয়ায় এমন অবস্থা ঘটিল যে শেষে টাকা দিয়াও খাদ্য মিলে নাই।' রেভেনিউ বোর্ড স্বীকার করিলেন, মিঃ র‍্যাভেন শ'র টেলিগ্রাম পাইয়া তৎক্ষণাৎ যদি কাজে নামা হইত, তাহা হইলে অসংখ্য জীবন রক্ষা পাইত।

১৯৪৩ অব্দের দুর্ভিক্ষেও ঠিক এই অবস্থা। আনাড়ি লোকের উপর ভার দিয়া বিস্তর অঘটন ঘটিয়াছে। একজনে একটা কাজের ভার পাইলেন, সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাঁহাকে অন্য বিভাগে চালান করা হইল। বাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য-সংক্রান্ত কর্মচারীদের এত রদবদল করিয়াছেন যে দ্রুততায় উহার কাছে সিনেমা-ছবিও হার মানিয়া যায়। ১৯৩৯ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য ছয়টি কনফারেন্স করিয়াছেন। ১৯৪২ অব্দের ডিসেম্বরে খাদ্য-বিভাগ সৃষ্ট হয়; ১৯৪২ অব্দের এপ্রিলে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিল হয়। ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিলে রিজিওন্যাল ফুড-কমিশনার নিযুক্ত হন। গড়ে মাস দুয়েক অন্তর পর পর চারি জন ফুড-মেম্বার হইলেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার; বাংলায় যে কত রকম পট-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই আমরা চোখের উপর দেখিয়াছি।

সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩ অব্দে ঠিক ১৮৬৬ অব্দের মতো অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। টাকা ফেলিলেও চাউল মিলে নাই। চাঁদা তুলিয়া নানা প্রতিষ্ঠান লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিল। সরকার মনে করিলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ হাঙ্গামাটা চুকাইয়া দিবে, তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার গরজ হইবে না। পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে, শহর-মুখো ধাওয়া করিয়াছে, কর্তাদের সেদিকে নজর পড়িল না।

অথচ এই অবস্থাই সকলের চেয়ে মারাত্মক। গ্রামের মধ্যে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিলে লোকের ঘর-গৃহস্থালি খানিকটা বজায় থাকিত, তাহারা কিছু কিছু আয় করিতেও পারিত, যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাবলম্বী হইয়া আবার মাথা তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকিত। দুর্ভিক্ষ গ্রামের মানুষকে তাড়াইয়া শহরে আনে। যে ছিল গৃহস্থ, আত্ম-সম্মান হারাইয়া সে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭৮ অব্দের দুর্ভিক্ষ-কমিশনে স্যর রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, 'খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যখন ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে, দুর্ভিক্ষে সেই অবস্থা সকলের চেয়ে ভয়াবহ। ইহার ফলে লোক নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রামে শৃঙ্খলার সহিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র হইবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে।'

১৮৬৬ অব্দেও লোকে ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছিল; ১৯৪৩ অব্দের মতোই সদর রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ পড়িয়া থাকিত। আগস্ট মাসে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেবার বিস্তর লোক মরিয়াছিল। দলে দলে অস্থিসার মানুষ লঙ্গরখানায় জমায়েত হইত। তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল না। সরকার লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের লোক আসিয়া শহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে।

...ন একরকম জোর করিয়াই শহরের অন্নসত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; দুঃস্থদের বাহিরে পাঠানো হইল। সত্তর বৎসর পরে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছি। সেবার কলিকাতা শহরে লোক জমিয়াছিল পনের ষোল হাজার। ১৯৪৩ অব্দে সরকারি অনুমান, একলক্ষ।

সেবারও রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। কটকের রিলিফ-ম্যানেজার মিঃ কার্কউডের মতে, এই প্রকার সাহায্য দানে গ্রহীতার নৈতিক অধোগতি হয়। এ কথা ঠিক যে,লোকে রান্না-করা খাদ্য গোপনে বিক্রি করিয়া উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু আর একটা দিক ভাবিবার আছে। বহু পরিবারেই এইরূপ সাহায্য লইতে ইজ্জতে বাধে, তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ অব্দেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সরকারি তরফ হইতে কি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল ?

১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই সরকার অবহিত হইয়াছিলেন, তাই সেবার বেশি লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। খাদ্যের সন্ধানে লোকে গ্রাম ছাড়িবার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পৌঁছায়, দেহের শক্তি অবশেষ হইবার আগে যাহাতে কাজ পায়, অতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রার্থী সাহায্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য সকলের চেয়ে প্রামাণ্য। শহরের উপর অন্নসত্র খুলিলে এই প্রমাণের উপায় থাকে না ; অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ অধিকাংশ দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পৌঁছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এইরকম গোলযোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাড়িতে বসাইয়া নামে নামে এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না করিলে সুশৃঙ্খল সাহায্য

অসম্ভব, এই ছিল তাঁহার অভিমত। পঞ্চাশ হইতে একশ'টি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইল; সমগ্র বাংলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিয়া ফেলা হইল। প্রতি কেন্দ্রে এক একটি বড় শস্যাগার—সেখান হইতে গ্রামের শস্যভাণ্ডারে খাদ্য পাঠান হইত। একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী প্রতি সপ্তাহে কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষ দমনের এই প্রচেষ্টা—সকল দিক দিয়া ইহাকে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইহা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে।

কিন্তু সেবার এত সুব্যবস্থার মধ্যেও চাউল রপ্তানি হইতেছিল। স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১২ই অক্টোবর (১৮৭৩) তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভারত-সরকারকে সতর্ক করিয়া অনুরোধ জানাইলেন যেন—(১) অবিলম্বে সেবাকার্য শুরু করিয়া দেওয়া হয়; (২) বাহির হইতে চাউল আনিবার বন্দোবস্ত হয়; এবং (৩) ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বড়লাট চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে রাজি হইলেন না; সেক্রেটারি অব স্টেটকে তাঁহার আপত্তির বিষয়ে জানাইলেন। যে সব ভারতীয় কুলি মরিসস ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ সিংহল ও অন্যান্য দেশে গিয়াছে (বেশির ভাগই ইউরোপীয় বাগিচায় কাজ করিতে) চাউল বন্ধ করিলে তাহাদের উপায় কি? ১৯৪৩ অব্দে অবিকল ইহারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। সিংহলের ভারতীয় কুলি, ভূমধ্যসাগরের ভারতীয় সৈন্য—তাহাদের সকলের ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইয়াছে। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে সুব্যবস্থা যত কিছু হইয়াছিল, কিছুই গ্রহণ করি নাই; কেবল সেবারকার চাউল রপ্তানি নীতিটা বহাল রাখিয়াছিলাম। *

---

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ সংগৃহীত উপাদানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

বাংলার সঙ্কট

আজ আমরা এক বিরাট জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। গবর্নমেণ্টের কোন কোন মুখপাত্রের পক্ষ হইতে এই কথা প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের ফলেই বর্তমান দুরবস্থা আসিয়াছে। ঐ মন্ত্রিমণ্ডলীর দোষগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু একটি ব্যাপার আমাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য অকপট চেষ্টা করিয়াছিলেন; যেখানে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই, সেখানেও তাঁহারা উহার কারণ বাংলার জনসাধারণ বা ব্যবস্থা পরিষদের নিকট হইতে গোপন রাখেন নাই। বাংলাদেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার জন্য মন্ত্রীদের কিছুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। একদিকে ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অন্যদিকে গবর্নরের হস্তক্ষেপ ও বাধাদানই ঐ জন্য দায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অপসারণনীতি, ভারতের বাহিরে খাদ্যশস্য রপ্তানি এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে চাউল-ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা যায়।

তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিদারুণ শঙ্কার মধ্যে অতিবাহিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করিলেন, জাপান ব্রহ্ম-জয় শেষ করিয়া বাংলায় অভিযান করিবে; শত্রুর অসুবিধা ঘটাইবার জন্য সমুদ্রকুলবর্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও অপরাপর যানবাহন এবং চাউলের অপসারণ একান্তরূপে আবশ্যক। তখনকার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব পরিষ্কাররূপে বলিয়াছিলেন, গবর্নর ও কতিপয় স্থায়ী কর্মচারী বাধাদানের মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছেন; উহার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীর অবলম্বিত নীতি কার্যে পরিণত করা অসম্ভব।

বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ আজ গর্ব করিতেছেন, ঐ বিভাগে খ্যাতিমান ভারতীয় কর্মচারীরা রহিয়াছেন। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী যখন এই বিভাগে ভারতীয় কর্মচারী লইবার চেষ্টা করেন, তখন গবর্নর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে উহা পণ্ড করিয়া দেন; বিভাগের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ য়ুরোপীয় ছাড়া আর কাহাকেও দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। ঐসব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য, তাঁহারা যে নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। সেই কর্মচারীরা এখনও নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—কাহারও কাহারও পদোন্নতিও হইয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশে তাঁহারা যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিবে কে? বে-সামরিক সরবরাহ-বিভাগ পরিচালনার জন্য হাইকোর্ট হইতে একজন জজকে আনা হইল। তিনি দ্রুত স্বস্থানে ফিরিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী কি কি করিয়াছিলেন এবং কি কি করিতে পারেন নাই, তাহার আলোচনা আজিকার দিনে প্রাসঙ্গিক নয়। গত মার্চ মাসে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয়; আক্রমণের প্রধান অস্ত্র ছিল, খাদ্য-সমস্যার সমাধানে উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর তথাকথিত অসমর্থতা। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ঐ বিষয়ে কি করিয়াছেন, আমি আজ সেই প্রশ্ন করিতেছি। ক্ষমতা-লাভের প্রারম্ভ হইতে ইঁহারা যে সকল সুযোগ পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইয়াছে কিনা, এবং এই প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহারা কাজ করিয়াছেন কিনা, সেই কথা নিরাসক্ত ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সরবরাহ-সচিব নূতন পদ পাইবার পর হইতে বিবৃতির পর বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমার দু-একটি কথা আছে। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী অন্তত একটি বড় কাজ করিয়াছিলেন—বাংলায় যে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে, একথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারত-সরকারকে দিয়া তাঁহারা স্বীকার করাইয়াছিলেন, খাদ্যশস্যের স্বল্পতায় এই প্রদেশ গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। ইহা গত মার্চ মাসের কথা। এপ্রিল মাসে সুরাবর্দি সাহেব বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পাইলেন। মনোরম ভাষায় তিনি বহু বিবৃতি দিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও অপর বহু বিবৃতি বাহির হইয়াছে। সেইসব বিবৃতি আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি।

বাংলাদেশে খাদ্যের স্বল্পতা নাই, চাউলের অভাব নাই;—বণ্টন-ব্যবস্থার দোষে, ছোট ছোট মজুতদার, সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকদের দোষে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—এই কথা বারম্বার ঘোষণা করিয়া বাংলার দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের সহিত সরবরাহ-সচিব এক বিরাট প্রতারণা করিয়াছেন। কেন ইহা করিলেন, ঈশ্বরই জানেন।

সুরাবর্দি সাহেবের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্যশস্যের স্বল্পতার উপরেই জোর দিতেন; তাঁহাদের খাদ্যনীতির ইহা দুষ্টতম অংশ। ইহা ১৭ই মে তারিখের ব্যাপার। সরবরাহ-সচিব বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে বাংলার অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইবার মতো যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে। আমাদের প্রতিপক্ষ সদস্যবৃন্দ মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেবের নিকট কৈফিয়ৎ চান। কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংলার অধিবাসীদিগের

পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য আছে? সুরাবর্দি সাহেব আরও বলেন, এই সম্পর্কে এক বিস্তৃত হিসাবের অঙ্ক শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে; তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে খাদ্যের প্রাচুর্য রহিয়াছে। কোথায় সে হিসাব?

বাংলা গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে বাংলা ও ইংরাজিতে নিম্নলিখিতরূপ এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়:

আবেদন ও সতর্কবাণী

An Appeal and a Warning

দরিদ্র জনসাধারণকে আর উৎপীড়ন করা চলিবে না।

You must not grind the faces of the poor.

সুরাবর্দি সাহেব কাহাকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিতেছেন? *বাংলার লোককে? না, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তিনি নিজেকেই সম্বোধন করিতেছেন?*

সত্যই কি বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে? না, নিশ্চয়ই না।

Is there a real shortage of food in Bengal? No, most certainly no.

জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুর্গতি সত্ত্বেও সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, খাদ্যের প্রকৃত অভাব নাই। তিনি বলিতেছেন—

তবে আসল ব্যাপারটা কি? এ বৎসরের শেষ পর্যন্ত আমাদের অভাব মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের ছিল এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতে আজ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হইতেছে। আড়তদার, ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন কৃষক এবং আরো অনেকে আতঙ্কবশত অথবা জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ করিবার আশায় প্রচুর খাদ্যশস্য গোপনে জমা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক সরকারি ভাবে যে সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, উপরোক্ত বিবৃতিটি তাহার অন্যতম। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই; প্রচুর খাদ্যসম্ভার রহিয়াছে, দেশের অধিবাসীরাই নিজেদের দুঃখ-দুর্গতি সৃষ্টির জন্য দায়ী,—ইহাই মোট কথা।

বড় বড় মজুতদার, বড় বড় আড়তদার বা বড় বড় মুনাফাকারীদের মজুত মালের সন্ধান করা হইল না। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইল, তাহারাই নাকি দরিদ্র সাধারণকে উৎপীড়িত করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিত হইল। গবর্নর এবং স্থায়ী সরকারি কর্মচারিবৃন্দের আশীর্ভাজন বাংলার নব মন্ত্রিমণ্ডলী যেই ইহা ঘোষণা করিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে কমন্স-সভাতেও অনুরূপ কথা উচ্চারিত হইল। মিঃ আমেরি বলিলেন, ভারতবর্ষে এবং বাংলায় কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই; লোকে শস্য মজুত করিতেছে এবং বণ্টনের অব্যবস্থা রহিয়াছে; গবর্নমেণ্ট সমস্যার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই যে চিত্র অঙ্কন করিলেন, ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি উহা হাতে লইয়া পার্লামেণ্ট হইতে জগতের নিকট ঘোষণা করিতে পারিলেন, *পূর্ব*-রণাঙ্গনের প্রান্তবর্তী বাংলার গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে—দিল্লি অথবা কলিকাতার গবর্নমেণ্ট কর্তৃক কোন ভ্রান্তনীতি অনুসরণের ফলে নয়; অধিবাসীরাই স্বার্থপর—তাহারা বাধা-উৎপাদক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে।

সুরাবর্দি সাহেব ঘোষণা করিলেন, বাংলায় প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে; তাঁহার কাজ, এই খাদ্য-সঞ্চয় খুঁজিয়া বাহির করা। এক বক্তৃতায় তিনি

ঘোষণা করিলেন, চাউল বাহির করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি নিজে গৃহস্থের তক্তপোষের নিচে প্রবেশ করিবেন। রাত্রিতে, এমন কি দিনের বেলাতেও যদি সুরাবর্দি সাহেব সত্য সত্যই গৃহস্থের বাড়ি ঢুকিয়া তক্তপোষের নিচে যাইতে আরম্ভ করেন! আমি জানি, অনেক গৃহস্থ খবর শুনিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জগদীশ্বর গৃহস্থদের রক্ষা করুন! যাহাতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্যা লইয়া ইহার চেয়ে নির্বোধ আচরণ আর কি হইতে পারে?

সুরাবর্দি সাহেব আরও একটি কারণ দেখাইলেন; বলিলেন, সমস্যাটি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত। অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কবে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন, আমার জানা নাই। তাহা হইলে তাঁহার স্থান কলিকাতায় না হইয়া রাঁচিতে হওয়া উচিত ছিল।

সমস্যাটি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত! অতএব, কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে? লোককে শুধু বলিতে হইবে, 'আতঙ্কগ্রস্ত হইও না। আমি সরবরাহ বিভাগে সচিব হইয়া বসিয়াছি। তোমাদের বলিতেছি, প্রচুর খাদ্যশস্য রহিয়াছে। আমাদের কাছে হিসাবের অঙ্ক আছে—তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না।' গবর্নমেণ্টের মুখপাত্র হিসাবে হয়তো তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস-দানের চেষ্টা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু রাইটার্স-বিল্ডিং হইতে কেবল এইরূপ যাদুদণ্ড নাড়িয়াই কি তিনি সাফল্যলাভ করিতে চান?

বিভিন্ন দলের নিকট পরামর্শ-গ্রহণের প্রয়োজন হইল না; তিনি কেবল মনস্তত্ত্বের কথা ও শিথিলভাবে সহযোগিতার কথা বলিতে লাগিলেন। জনমতের সমর্থন চাহিলেন না; অকপটভাবে সকলের সহযোগিতা কামনা করিলেন না। দলগত নীতির প্রভাব

তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ১৭ই মে তারিখে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গকে আহ্বান করা হইল। সকলেই (মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রশংসায় মুখর য়ুরোপীয় দল পর্যন্ত) দাবি করিলেন, কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্বে গবর্ণমেণ্টের সমগ্র কার্যক্রম নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। সরবরাহ-মন্ত্রী ও প্রধান-মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে পরিকল্পনার কথা গবর্নমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন তাহার অনুলিপি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে দেওয়া হইবে। অতঃপর দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল। নিতান্ত আনাড়ি ও অক্ষম লোকের দ্বারা পরিচালিত খাদ্য-অভিযান কার্যত আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে অকস্মাৎ বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গকে পরিষদ-গৃহে ডাকা হইল। ইতি-মধ্যে আমাদিগকে কয়েকটি মফস্বল শহরে যাইতে হয়; সেখানে অন্য লোকে সরকারি পরিকল্পনার অনুলিপি আমাদের হাতে দিল। উহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ৮ই অথবা ৯ই জুন হইতে ঐ পরি-কল্পনা অনুযায়ী কাজ হইবে, এই উপদেশ সহ উহা সমগ্র প্রদেশে বিলি করা হইয়াছিল। খাদ্য-অভিযান যখন আরম্ভ হইবার কথা, তাহারই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ ও মন্ত্রীদের মধ্যে আলো-চনার এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

এই অভিযান-পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পরিষদকে বিপন্ন করিতে চাহি না। দেশের মধ্যে এমন কেহ নাই, মজুত খাদ্যশস্যের হিসাব-গ্রহণে যে আপত্তি করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনেক পূর্বেই এই হিসাব লওয়া উচিত ছিল। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্নর সে সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। তিনি বলেন, উহার প্রয়োজন নাই; বাংলার সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও চাউল অপসারণ সম্পর্কে অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য রহিয়াছে। অন্যথা

জাপানিরা আসিয়া পড়িলে তাহারা ঐ সকল সম্পদের সুবিধা পাইবে।

শুধুই যদি হিসাব-গ্রহণের ব্যাপার হইত, তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, হিসাব-গ্রহণ অপেক্ষা তাহার ব্যাপকতা অনেক অধিক। বাংলার এক দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আজ সকালেই আমি একখানি বাংলা প্রচার-পত্র পাইয়াছি। যে পরিকল্পনার জন্য সুরাবর্দি সাহেব মৌলিকতার দাবি করেন, এই প্রচারপত্রই তাহার ভিত্তি। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পল্লীউন্নয়ন বিভাগ হইতে মিঃ ইস্‌হাকের স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার প্রকাশিত হয়। দিনের পর দিন চিন্তা করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার অধিবাসীদের উপকারার্থ যে পরিকল্পনা আবিষ্কার করিয়াছেন—দেখা গেল, এই সার্কুলার হইতেই তাহার উৎপত্তি। কেবল একটি ব্যাপারে সুরাবর্দি সাহেবের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, উদ্বৃত্ত শস্যের হিসাব করিবার সময় দরিদ্র-পরিবারে চারি বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের বাদ দিতে হইবে; তাহারা ভাত খায় না, ধরিয়া লইতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেব এই সহজ কথাটিও কি জানেন না যে, 'হরলিকস্ মিল্ক' অথবা ধনিগৃহের অন্য কোন শিশুভোগ্য খাদ্য গরিবদের ছেলেরা খাইতে পায় না? পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ইস্‌হাক কিন্তু চারি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হিসাবে ধরিয়াছিলেন। সুরাবর্দি সাহেবের পরিকল্পনায় শিশুদের কার্যত অনশনে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

খাদ্য-অভিযানের ফল কি হইয়াছে? গোড়া হইতেই আমরা বলিয়াছিলাম, অতি-মূল্যবান সময়ের গহিত অপব্যয় ছাড়া এই অভিযানে কোন লাভ হইবে না। ভারতরক্ষা-বিধি অনুসারে এক আদেশ জারি

করা হইল, স্বরাষ্ট্র-বিভাগের নিকট পরীক্ষার জন্ম পেশ না করিয়া কোন সংবাদপত্র খাদ্য-অভিযান সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। মিঃ সিদ্দিকির ভাষায় 'যাঁহারা স্বাধীনতাকে বাধা-মুক্ত করিতেছেন'—ইহাই তাঁহাদের কর্তৃত্বের নমুনা। যাহারা পরিকল্পনার মূলগত ত্রুটি ধরাইয়া দিতে চাহে, অথবা তাহার আলোচনা করিতে চাহে, এইভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ করা হইল। সম্মিলনে আমরা গবর্নমেণ্ট-কর্মচারীদের এবং সুরাবর্দি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মন্ত্রি-মণ্ডলী কার্যত কি করিতে চাহেন? যাহা লইয়া এত হৈ-চৈ হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে কি? ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। একস্থানে মন্ত্রিমণ্ডলী বলিয়াছেন, গ্রামগুলিকে তাঁহারা স্বাবলম্বী করিতে চাহেন—স্থানিক স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ হইবার পূর্বে কোনও স্থান হইতে তাঁহারা উদ্বৃত্ত চাউল অপসারণ করিতে চাহেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলাম, ধনী ব্যবসায়ী ও মুনাফাকারীদের বাংলার সর্বত্র অবাধে কাজ চালাইয়া যাইতে সম্মতি দেওয়া হইতেছে। শকুনির মতো এই সকল ব্যবসায়ী ও মুনাফাকারী বিচরণ করিতে লাগিল। ভারতরক্ষা-বিধি প্রযুক্ত হইবে, বলপূর্বক চাউল আটক করা হইবে—এইরূপ নানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত লোকেরা যে চাউল বাহির করিল, ইহারা অত্যধিক মূল্যে তাহা কিনিয়া কলিকাতা অঞ্চলে সরাইয়া দিল। ফলে পল্লী-অঞ্চলে যে চাউল পাওয়া যাইতেছিল বা পাওয়া যাইতে পারিত তাহা অপসারিত হইল; সমগ্র পল্লী-অঞ্চল এইরূপে চাউল-শূন্য হইয়া গেল। কাগজপত্রে ছাড়া ঘাটতি পূরণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। সুরাবর্দি সাহেব বিবৃতিতে বলেন, খাদ্য-অভিযানের ফলে মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই ধরণের তিনটি

বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন চাউল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ক্ষিপ্রবেগে মূল্য বাড়িতে লাগিল, তখন সকল বিবৃতির অবসান ঘটিল। বিগত এক পক্ষকাল মূল্য সম্পর্কে নীরব থাকিয়া সুরাবর্দি সাহেব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এখনও বাংলার সকল অঞ্চল হইতে আমার কাছে সংবাদ আসে নাই। কিন্তু যথোচিত দায়িত্ব সহকারে আমি বলিতেছি, ১৯৪৩ অব্দের ২৫শে জুনের কাছাকাছি সময়ে চাউলের যে মূল্য ছিল, আটটি জেলায় তাহা হইতে মন প্রতি ৩৲ হইতে ৫৲ বর্ধিত হইয়াছে। শিলিগুড়িতে ৪॥০ ; রংপুরে ৪৲ ; মাণিকগঞ্জে ৪৲ ; ময়মনসিং-এ ৪৲ ; নেত্রকোনায় ৬৲ ; যশোহরে ৫॥০ ; খুলনায় ৫৲ ; সাতক্ষীরায় ৫৲ বাড়িয়াছে। অন্যান্য স্থানের অবস্থাও প্রায় এই প্রকার। খাদ্য-অভিযান হইতেই আমাদের এই লাভ হইয়াছে।

কলিকাতা এবং হাওড়াকে এই অভিযান হইতে কেন বাদ দেওয়া হইল? মন্ত্রিমণ্ডলী যদি অকপট ইচ্ছা লইয়া আন্তরিকতার সহিত কাজে নামিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা ও হাওড়াতেই প্রথম কাজ শুরু হইত। ইস্পাহানি-কোম্পানি ও অন্যান্য ধনী মুনাফাদারদের মজুত মালের হিসাব কি কারণে লওয়া হইল না? সরবরাহ-সচিবই বলিয়াছেন, এই প্রদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের জন্য ইস্পাহানি-কোম্পানি চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার আরও অনেক য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। অভিযানের সময় কেন ইহারা বাদ থাকিয়া গেল?

কারণ ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করা সহজসাধ্য নয়। এমন সব স্থান রহিয়াছে, যাহার কাছে ঘেঁসিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুরাবর্দি সাহেবের সাহসে কুলায় না। মন্ত্রিমণ্ডলীকে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। তাই অভিযান

প্রধানত দরিদ্র গৃহস্থ এবং কৃষকদিগের বিরুদ্ধে চলিল। এখন অবশ্য কলিকাতায় হিসাব-গ্রহণ করিতে বলা একেবারে নিরর্থক। সুরাবর্দি সাহেবেরই একজন সমর্থক এক প্রচারপত্রে বলিয়াছেন কলিকাতায় এখনযদি খাদ্য-অভিযান চালান হয়, তাহাতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। চাউল ইতিমধ্যেই এখান হইতে অন্যত্র অপসৃত হইয়া যাইবে।

খাদ্যশস্যের ঘাটতি সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেব আমাদিগকে কোন খবর জানান নাই। তিনি বলিতেছেন, তথ্য-সংগ্রহ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই তথ্য কখনও প্রকাশিত হইবে না। কারণ তাহাতে প্রতি অঞ্চলেই বিপুল ঘাটতির বিবরণ প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ষাট-সত্তর লক্ষ মন উদ্বৃত্ত চাউল হস্তগত হইয়াছে। এই হিসাব আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ইহাতে ঘাটতির কথা ধরা হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি যে পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে ভুল নাই তো? আশা করি সুরাবর্দি সাহেব উত্তর প্রদান কালে তাঁহার বিবৃতিটা আবার যাচাই করিয়া দেখিবেন। কয়েক দিন পূর্বে কলিকাতার এক সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ আট নয় লক্ষ মণ হইবে; ষাট সত্তর নয়।

ষাট-সত্তর লক্ষ এবং আট-নয় লক্ষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। কিন্তু যদি সত্তর লক্ষও হয় তাহা হইলে মিঃ ডেভিড হেনড্রি যেরূপ বলিয়াছেন—ইহা বাংলার অধিবাসীদিগের মাত্র পনর দিনের খাবার। তাহাও যদি কোন অঞ্চলে কিছুমাত্র ঘাটতি না থাকে। ইহার পরে কি হইবে? সুরাবর্দি সাহেবকে আমি এই পরবর্তী অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, খাদ্য-অভিযানে মানুষের প্রয়োজনের

অনুরূপ মজুত মাল কখনই বাহির হইবে না। আমরা বলিয়াছিলাম, 'আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া সমগ্র দায়িত্ব জনসাধারণের উপর আরোপ করিতেছেন। এই বিষয়ে ব্যর্থ হইলে তাহার পরে আপনারা কি করিবেন?' তিনি বলেন, 'তাহা আমি জানি না।'

[মিঃ সুরাবর্দি বলিলেন, তিনি একথা বলেন নাই।]

আপনি নিশ্চয় বলিয়াছেন, 'আমি জানি না।' আপনি যদি তাহা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।

[মিঃ সুরাবর্দি বলিলেন, পরে কি করা যাইবে তাহা তিনি জানেন না—এই কথাই বলিয়াছিলেন।]

তিনি স্বীকার করিতেছেন, পরে কি করা যাইবে তাহা তিনি জানিতেন না। অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সে সম্পর্কে কোন কিছু ঠিক না করিয়াই কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে কি এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত হইয়াছিল? এই প্রকারেই কি তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন?

[মিঃ সুরাবর্দিকে অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতে শোনা গেল।]

ওরূপ ভাবে কিছু বলিয়া লাভ হইবে না। যদি সুরাবর্দি সাহেব বলেন যে খাদ্য-অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কি পন্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা তিনি জানিতেন না, তাহা হইলে আমি বলিব তিনি দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন; স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই।

মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠনমূলক কার্যাবলী অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ অবাধ-বাণিজ্যমণ্ডলের কথা এবার কিছু বলিব। সুরাবর্দি সাহেব ইহাকে প্রকাণ্ড বিজয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্যর নাজিমউদ্দিন

আরও ফলাও করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা পূর্ব-ভারতে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছি।' বাংলায় এক কণিকা চাউল আনয়ন না করিয়াই অথবা জনসাধারণের বিন্দুমাত্র উপকার না করিয়াই আজ সেই অবাধ-বাণিজ্য অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য এই সুযোগে সুরাবর্দি সাহেব রহস্যময় সর্তে ইস্পাহানি সাহেবকে বাংলা গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে একমাত্র ক্রেতা নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। আমি বলিতে চাই, স্থির সিদ্ধান্তের অভাব, ব্যস্ততা এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা-দান করিবার আগ্রহে মন্ত্রিমণ্ডলী অবাধ-বাণিজ্য পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; গোড়া হইতেই গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। বাংলাদেশকে সেবা করিবার এক বিরাট সুযোগ তাঁহারা এইভাবে হারাইয়াছেন।

বিহার এবং উড়িষ্যা সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেব কি করিয়াছেন? পরিষদ-গৃহে মেজাজ হারাইয়া লাভ নাই; তাঁহাকে উত্তর দিতেই হইবে। আমি তথ্য প্রদান করিয়াছি, তাঁহাকেও তথ্যপূর্ণ উত্তর দিতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেব কেন বিহার ও উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্টের সহিত আলোচনা করেন নাই? ধনী ব্যবসায়ী এবং অপরাপর বেসরকারি লোককে তিনি চাউল কিনিবার অখণ্ড স্বাধীনতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ফল কি হইয়াছে? চাউলের মূল্য সেখানে ৬৲ ৮৲ এবং ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ ও ১৮৲ টাকার মধ্যে ছিল। যে কোনও দামে চাউল কিনিবার জন্য প্রচুর টাকা লইয়া বাংলা হইতে লোক চলিয়া গেল; দুর্ভিক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের ন্যায় বাংলা হইতে উড়িষ্যা এবং বিহারে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ও উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবহারে অবশ্য পার্থক্য আছে। উড়িষ্যার মন্ত্রী সাহসিকতার সহিত ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন; বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের জন্য মাত্র একটি জেলা বালেশ্বর

হইতেই এক পক্ষ কালের মধ্যে সত্তর জন লোকের অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় সংবাদ গোপন করিয়া অবিরত সরকারি দায়িত্ব এড়ানো হইতেছে। এইভাবেই আমরা প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সহানুভূতি এবং সহযোগিতা হারাইয়াছি।

বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের বাধামুক্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সস্তাদরে চাউল কিনিয়া লাভবান হওয়াই তাহাদের মতলব। উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্ট ইহাতে বাধা দিলেন; বিহার-গবর্নমেণ্টও সেই পন্থা অনুসরণ করিলেন। সুরাবর্দি সাহেব পরে তাঁহাদের সহিত আলোচনা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিতে চাই, সর্বপ্রথমেই এই আলোচনা করা বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর একান্ত করণীয় ছিল। কি কারণে সুরাবর্দি সাহেব তখন উড়িষ্যা ও বিহারে যাইতে দ্বিধা করিয়াছিলেন? পাকিস্তানের সমর্থক হিসাবে তিনি ভবিষ্যৎ হিন্দুস্থানের অংশ বিহার ও উড়িষ্যার নিকট অনুগ্রহ চাহিতে যাওয়া পছন্দ করেন নাই—কারণ কি ইহাই? হায় রে, পাকিস্তানের অর্থনীতিক ভিত্তি যে ধ্বসিয়া পড়িতেছে! পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ দুর্গ বাংলাকেই পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রদেশসমূহের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেবকে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া বাংলা ও ভারতবর্ষের সমস্যার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত কিছুতে সম্ভব হইবে না।

আমি প্রশ্ন করিতেছি, কি কারণে সুরাবর্দি সাহেব বিহার-সরকার এবং উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে গিয়া পূর্বাহ্নে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই? কেন তিনি বলেন নাই, আমরা অনশনে আছি, আপনারা কি পাঁচ দশ লক্ষ মন করিয়া চাউল বাংলাকে দিতে পারেন না? ব্যবসায়ী এবং দালালেরা যথেচ্ছ আচরণে মূল্য বিপর্যস্ত করিয়াছে;

ইহার সুযোগ না দিয়া বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার গবর্নমেণ্ট একত্র বসিয়া মূল্য সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলী এই প্রণালীতে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

ইস্পাহানি-কোম্পানিকে বাংলা-গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে একমাত্র ক্রেতা নিযুক্ত করিবার সম্পর্কে এইবার আমি আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি, ইস্পাহানি সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছু বলিবার নাই। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদারদের আমি চিনি না বলিলেই চলে। বস্তুত ইহা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, নীতিগত প্রশ্ন। মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা যে তাঁহারা একটি বিশেষ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে সোল-এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং দলিল স্বরূপ একটুকরা কাগজ না লইয়াও তাঁহাদিগকে প্রায় দুই কোটি টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। বাংলা গবর্নমেণ্ট এবং ইস্পাহানি কোম্পানির মধ্যে চুক্তিসম্পর্কিত একটি দলিলও কি সুরাবর্দি সাহেব দেখাইতে পারেন? এ বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্দেশ লওয়া হইয়াছিল কি? ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হিসাবে আমরা এখানে বসিয়া বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। বাজেট কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে বাজেট বিবেচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু বিবেচনার জন্য গত সপ্তাহে পেশ করা হইয়াছিল। ইস্পাহানি-কোম্পানিকে যে উপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত দুই কোটি টাকা বা ততোধিক অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে ঐ বাজেটে তাহার উল্লেখমাত্র ছিল না। সাধারণ তহবিল হইতে অননুমোদিত ও একেবারে বে-আইনি ভাবে উহা ব্যয় করা হইয়াছে।

আমি অভিযোগ করিতেছি, বাংলা-গবর্নমেণ্ট ও ইস্পাহানি-

কোম্পানির মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন সর্ত চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলীর যদি সাহস থাকে, তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করুন। এ বিষয়ে কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই। ইহাদের সহিত যে সকল সর্ত হইয়াছে, অন্য কাহাকেও সে সর্তে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বাংলা-গবর্নমেণ্ট যে জামিনের দাবি করেন, ইস্পাহানি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে এত টাকা একটি ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইল, যাহার একজন অংশীদার মিঃ সুরাবর্দির দলের প্রধান সমর্থক। ইহার চেয়ে গুরুতর কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য বঙ্গসন্তানের সেবাই নাকি ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য! জিজ্ঞাসা করি, তাহার জন্য এই অসাধারণ পন্থা কেন অবলম্বন করা হইল? কেন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই? সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন, চেম্বার অব কমার্সগুলির পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরিষদ-গৃহে এমন নির্লজ্জ মিথ্যা আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। গতকল্য মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি বলেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আমাকে বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সহিতও কোনপ্রকার পরামর্শ হয় নাই। বাংলার জনসাধারণকে এবং ব্যবস্থা পরিষদকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য কেন এই চেষ্টা? ইস্পাহানি-কোম্পানি চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা ছাড়িয়াছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কি বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমি জানি না। সম্ভবত সুরাবর্দি সাহেব তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন। আমার অনুমান, ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-রূপ ঘটিয়াছে। অবশ্য আমার

প্রদত্ত এই অঙ্কগুলি সম্পূর্ণ আনুমানিক। ধরা যাক, ইস্পাহানি-কোম্পানির নিকট পাঁচ লক্ষ মন চাউল আছে। কলিকাতার বাজার দরে তাহা প্রতি মন ৩০৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইস্পাহানি কোম্পানি হয়তো এই সময় বলিলেন, "আমরা আপনাদের নিকট এই চাউল প্রতি মন ২২৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিব।" ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, প্রতি মনে ইস্পাহানি কোম্পানি ৮৲ টাকা মুনাফা ছাড়িয়া দিয়াছেন; চাউলের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ মন হইলে মুনাফা হইতে মোটের উপর চল্লিশ লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, কি মূল্যে ইস্পাহানি-কোম্পানি ঐ চাউল কিনিয়াছিলেন? দশ টাকা, বারো টাকা, পনের টাকা,—কি মূল্যে? এই সম্পর্কে কোন তদন্ত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নয়?

কোন্ নীতি অনুসারে বাংলা-গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের অনুগৃহীত মুনাফাকারীদের আশ্রয় দিতেছেন? বাংলার অধিবাসীদের অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশায় ডুবাইয়া কেন এই সকল ব্যক্তিকে কাঁপিতে দিয়াছেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থক যে মুসলমান সদস্যগণ বসিয়া আছেন তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্যাপারটিকে দলগত প্রশ্ন হিসাবে না দেখিয়া নিরাসক্তভাবে সমগ্র পরিস্থিতির কথা বিচার করেন। ইহা মুসলীম লীগ, কংগ্রেস অথবা কোন দল-বিশেষের প্রশ্ন নহে।

পূর্বতন মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকালেও ইস্পাহানি-কোম্পানির সহিত এক বেনামি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু জানা গিয়াছে, গবর্নরের আদেশ অনুসারে জয়েণ্ট-সেক্রেটারি উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পরিষদ-গৃহেই ফজলুল হক সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার উক্তির এখন পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

ইস্পাহানি-কোম্পানি যখন গবর্নমেণ্টের এজেণ্ট রূপে কাজ করিবেন

তাঁহারা নিজেদের হিসাবে চাউল কিনিবেন না, এইরূপ কথা হয়। কিন্তু ইস্পাহানি কোম্পানি এই সর্তে রাজি হন নাই। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতিক্রমে নিজেদের হিসাবেই তাঁহাদিগকে চাউল কিনিবার অনুমতি দিতে হইবে। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সর্ত সম্বন্ধে এখনো কিছু ঠিকঠাক হয় নাই, অথচ ইতিমধ্যেই মুসলীম-লীগ দলের অনুগৃহীত এই সদস্যের হাতে সরকারি তহবিল হইতে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহার তুলনায় অনেক সামান্য অভিযোগে মিঃ হেনড্রি এবং তাঁহার দল ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিতে বিরত হন। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই ধরণের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। মিঃ হেনড্রি এবং তাঁহার দল এখন কি করিবেন? ঐ ওখানে তাঁহারা শান্ত মেষশাবকের ন্যায় বসিয়া আছেন। মিঃ হেনড্রি মন্ত্রিমণ্ডলীকে সার্টি-ফিকেট দিয়াছেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতেও আবার পালটা সার্টিফিকেট প্রত্যাশা করিয়াছেন। 'আমি তোমার পিঠ চুলকাইয়া দিতেছি, তুমিও আমার পিঠ চুলকাইয়া দাও'—ব্যাপারটা এই রকম আর কি!

[সরকার-পক্ষ হইতে একজন বলিলেন, 'ইঁহারা আপনাদেরও পিঠ চুলকাইয়াছিলেন।']

ইহারা আমাদের পিঠ চুলকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সত্য কথা। কিন্তু পরে দেখিলেন, ব্যাপারটি তাঁহারা যেরূপ প্রত্যাশা করেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমরা তাঁহাদের খুশি করিতে আদৌ প্রস্তুত নহি। তখন গত মার্চ মাসে য়ুরোপীয় দল বিরোধী দলে যোগদান করেন।

মিঃ ম্যাকইনস্ কেন পদত্যাগ করেন, মিঃ সুরাবর্দির নিকট

হইতে পরিষদ সে কথা জানিতে চাহেন। মিঃ ম্যাকইন্‌স্‌ বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করেন, ইহা কি সত্য নয়?

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যেভাবে সরবরাহ-বিভাগের কাজ চালাইতেছিলেন তাহাতে অতি মাত্রায় অসন্তুষ্ট হইয়াই মিঃ ম্যাকইন্‌স্‌ চলিয়া যান। তিনি কি বলেন নাই,—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোন বিশেষ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি বিভাগের কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে এই রকম লোক-দেখানো মারফতিভাবে কাজ না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ঐ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সহিত গবর্নমেণ্টের কাজ চালানো উচিত? এই বিষয়ে আমি মাত্র আর একটি কথা বলিব—

[সিদ্দিকি সাহেব অস্পষ্ট ভাবে কি বলিলেন।]

সিদ্দিকি সাহেব আমাকে বাধা দিতেছেন। তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে, তাহাতে আমি আনন্দিত। সেদিন সিদ্দিকি সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে তিনি কোন দল-বিশেষের মুখ চাহিয়া কাজ করেন না। তাঁহার ধৈর্য হারাইবার প্রয়োজন নাই—আমিই তাঁহার নিকট এইবার একটি নিয়মতান্ত্রিক সমস্যা উপস্থিত করিতেছি। মে লিখিত 'পার্লামেণ্টারি প্র্যাকটিস'-এর প্রথম অধ্যায় ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাউস অব কমন্সের কোন সদস্য যদি গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টর হন, তাঁহার ভোট দিবার অথবা হাউস অব কমন্সের সদস্য থাকিবার অধিকার থাকে না। ইহা আইন-সমর্থিত একটি প্রথা। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সুস্পষ্ট বিধানের উপর এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত। মিঃ সিদ্দিকি নিয়মতান্ত্রিকতা এবং ইংল্যাণ্ড, তুরস্ক, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হনলুলু প্রভৃতি সর্বস্থানের পার্লামেণ্টীয় বিজ্ঞতার জন্য বিখ্যাত। তিনি কি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, উপরোক্ত

নীতি অনুসারে মিঃ ইস্পাহানি অথবা অন্য যে কোন গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে আর পরিষদের সদস্য থাকা উচিত হইবে না ?

[সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলেও কণ্ট্রাক্টর ছিল।]

কোন পরিষদ-সদস্য যদি সে আমলে গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টর রূপে কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখানো বিধেয় নয়। বস্তুত, এই কপটতা বাংলার জনসাধারণের সম্মুখে নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হইতেছে বণ্টনের পদ্ধতি। আমি খুব সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। গবর্নমেণ্ট বলিতেছেন, কণ্ট্রোল-দোকান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহারা আট শত পর্যন্ত সরকারি দোকান খুলিবার কল্পনা করিতেছেন। কণ্ট্রোল-দোকানের পক্ষ হইতে ওকালতি করিতেছি না। আমি জানি, প্রধানত দুই কারণে কণ্ট্রোল-দোকানগুলি ব্যর্থ হইয়াছে : (১) সরবরাহের অভাব, এবং (২) কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনাচার। যদি অনাচারের জন্য কণ্ট্রোল-দোকানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নির্মমভাবে সেই অনাচার দূর করিতে হইবে ; ইহাতে কেহ কোন-প্রকার দোষ দিবে না। কিন্তু ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পথ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট-করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? গবর্নমেণ্টের বণ্টন-নীতির সহিতও ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। ক্রয় সম্পর্কে কিন্তু আমি এরূপ কথা বলিতেছি না ; সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

বণ্টন সম্পর্কে কি জন্য এই প্রস্তাব হইতেছে যে, ব্যবসায়ের সাধারণ পন্থা বর্জন করিয়া সরকারি দোকান খুলিতে হইবে ? প্রস্তাবিত

দোকানের স্বরূপ কি হইবে? কি মূল্যে কাহাদের উপর উহার ভার দেওয়া হইবে? কি কি বিষয় আলোচনা করিয়া কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঐ সকল দোকান খোলা হইবে? পূর্বতন মন্ত্রিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি অন্তত তিন বৎসর কাল ব্যবসায়ের সহিত লিপ্ত না থাকিলে সে কণ্ট্রোল-দোকান পাইবার অধিকারী হইবে না। এই নিয়মটি অনাচারনিবারণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। কি কারণে ইহা উপেক্ষিত হইল? সাম্প্রদায়িক এবং দলগত ভিত্তিতে অনুগ্রহ-বন্টনের পক্ষে নিয়মটি কি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল?

অধিক-খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন কিরূপ চলিতেছে? এই বিষয়ে সরকারের গঠনমূলক প্রস্তাব সম্পূর্ণত আমরা জানিতে চাই। প্রচার-কার্য লোক ভুলাইবার পন্থা মাত্র; কাগজের উপরে খাদ্য উৎপন্ন হইবে না। প্রতিদিন আমরা বাংলার বহু অঞ্চল হইতে চিঠি পাইতেছি, কৃষির উপযোগী বীজের অভাব; গবর্নমেণ্ট যদি এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসরও ভাল আমন ধান জন্মিবে না। সমস্ত প্রদেশ প্রায় চাউলশূন্য হইয়াছে, তাহার উপর যদি পরবর্তী আমন ধানের আশাও অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে বাংলা দেশের কি শোচনীয় পরিণতি ঘটিবে? মন্ত্রিমণ্ডলী সংবাদ পাইতেছেন কিনা জানি না—দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা রোগে অসংখ্য গবাদি পশু মারা পড়িতেছে। সামরিক উদ্দেশ্যেও প্রচুর পরিমাণে গবাদি ক্রয় করা হইতেছে। এই পরিষদেরই জনৈক সদস্য সম্প্রতি স্বগ্রাম হইতে আসিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার চোদ্দটি বলদের ভিতর তেরোটি বসন্তে মারা গিয়াছে, একটিমাত্র জীবিত আছে। ইহাই বাংলার সাধারণ অবস্থা। আগামী কয়েক মাসে নানা সংক্রামক ব্যাধি-বিস্তারের

ফলে বাংলার জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে, তাহার কথা কি মন্ত্রিমণ্ডলী চিন্তা করিতেছেন ? নিঃশেষিত-জীবনীশক্তি লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর উপর উহা চরম আঘাতের ন্যায় পতিত হইবে। অনশন এবং রোগে যাহাতে মানুষের মৃত্যু না ঘটে, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ?

প্রতিকারের উপায় কি ?

উপায়, গবর্নমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষ-প্রতিকারের জন্য সহৃদয়তার সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে। গবর্নমেণ্ট পরিশোধের কিছুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিবেন না, গ্রাম্য-কমিটী সামর্থ্য অনুসারে যাহা হয় করিবেন, এই ভিত্তিতে স্বল্পাবশিষ্ট চাউল বলপূর্বক ধার করিবার নীতি-প্রয়োগ অথবা স্বাবলম্বন সম্পর্কে সস্তা উপদেশ দান—এই সকলের পরিবর্তে বাংলার অধিবাসীদের আহার্য যোগাইবার পূর্ণ দায়িত্ব গবর্নমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলী হয় জনসাধারণকে খাওয়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, নতুবা পদত্যাগ করুন। কার্যত যখন ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টেরই পূর্ণ শাসন চলিতেছে, তাঁহারাই অধিবাসীদের খাওয়াইবার এবং প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

মূল-সমস্যা সমাধানের জন্য মূল্য ও সরবরাহের পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। মিঃ হেনড্রি ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা করিবার তিনটি পন্থা আছে। গবর্নমেণ্ট একাই সমস্ত মাল ক্রয় করিতে পারেন ; ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিতে পারেন ; অথবা গবর্নমেণ্ট ও ব্যবসায়ী উভয়ে মিলিয়া ক্রয় করিতে পারেন। গবর্নমেণ্ট বাজারে আসিবার ফলেই সমগ্র পরিস্থিতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনই ইহার প্রতিকার হইবে না। ব্যবসায়ীদিগকে অবাধ-ক্ষমতা দিলেও প্রদেশের

শস্য নিঃশেষিত হইবে ; তাহাতে বণ্টন-ব্যবস্থারও সঙ্গতি ও সাম্য রক্ষিত হইবে না। একমাত্র গবর্নমেণ্টই মূল্য এবং সরবরাহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং তাহার ফলে রেশনিং প্রবর্তিত হইতে পারে। রেশনিং-এর অর্থই হইতেছে সরবরাহের সম্পর্কে সরকারি প্রতিশ্রুতি। সরবরাহের সুব্যবস্থা ছাড়া রেশনিং চলিতে পারে না। গবর্নমেণ্ট বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহা রেশনিং নহে ; ইহাতে লোককে কার্যত অনশনে রাখা হইতেছে। সরবরাহ অব্যাহত নাই ; এবং গবর্নমেণ্টও একথা বলিতেছেন না যে, রেশনিং প্রবর্তিত করিয়া তাঁহারা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। যদি সর্বশ্রেণীর মধ্যে সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে ন্যায় ও সাম্যের নীতি অনুসৃত হয়—তাহা হইলে লোকে দুঃখ-ভোগ ও ত্যাগ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে।

কি প্রকার গবর্নমেণ্টের পক্ষে এই দায়িত্ব লওয়া সম্ভব ? বাংলার এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় কোন একটি দলের লোক লইয়া গঠিত গবর্নমেণ্টের পক্ষে মূল্য ও সরবরাহের উপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার ছয় কোটি লোকের আহার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আমাদের এই বিরোধী দলও যদি গবর্নমেণ্ট গঠন করেন এবং মুসলীম-লীগ বিপক্ষ দলভুক্ত থাকেন, তবু সমস্যার সমাধান হইবে না। বস্তুত আজ দল-গত বৈষম্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে হইবে ; মন্ত্রিমণ্ডলীকে সর্বশ্রেণীর আস্থাভাজন হইতে হইবে। সাহায্য-দানের চেষ্টা অকপট হইবে ; সমস্যাটি জাতীয়তার দিক দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনীতিক এবং দলগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হইলে কোনরূপ সমাধান হইবে না। যে সকল দল এবং উপদল একত্র কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলীতে থাকিবেন।

[শ্রীযুত রসিকলাল বিশ্বাস বলিলেন 'আপনিও তাঁহাদের মধ্যে থাকিবেন তো ?']

না, আমি নই। অপরের হস্তের ক্রীড়নক হইতে আমি চাই না। তাহা হইলেও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, এমন যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত লোকের অভাব হইবে না। এই জাতীয়-সঙ্কটের সম্মুখে দলগত মনোভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রিটিশ-পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল দল-বিশেষের স্বার্থের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, যাহাতে সমগ্র প্রদেশের মঙ্গল সাধিত হয়, এইরূপ কোন মীমাংসায় সকলে মিলিত হইতে পারিলে, তবেই দলগত মনোভাব অন্তর্হিত হইবে।

দু'একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমি বক্তব্যের উপসংহার করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত করিব না, কারণ তাঁহার অভিমত হয় তো পক্ষপাতদুষ্ট বলা হইবে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণই বলিয়াছেন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যেন অলঙ্ঘ্য রীতি অনুক্রমে একের পর এক ঘটিয়া আসিতেছে। যখন মোগল-সাম্রাজ্যের বাহু বাংলার দিকে বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময় গৌড়রাজ্যে আকস্মিক মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। বিশাল সুন্দর নগর গৌড়—শুধু বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের গৌরব ছিল ; এক বৎসরের মধ্যেই উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। হাণ্টার অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে উহা ব্যাঘ্র এবং বানরকুলের আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর মোগলসাম্রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিল। কয়েক শতাব্দী পরে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলিয়া কথিত ১৭৭০ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরাজরা এই সময়েই বাংলায় আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। আজও আমরা পুনরায়

দুর্ভিক্ষ এবং গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছি। বাংলার সমস্ত অঞ্চল হইতে দুর্গতি দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। একান্ত বশম্বদ মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত সুমিষ্ট বাক্যালঙ্কৃত ইস্তাহারে অবস্থার গুরুত্ব গোপন বা লঘু করিবার জন্য যত চেষ্টাই হউক, নিয়তি ইতিহাসের বিস্ময়কর ও ভয়াবহ পুনরাবৃত্তির দিকে অমোঘ অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, বর্তমানে অবিকল তাহাই ঘটিতে যাইতেছে। বিষয়টি আমাদের নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হাণ্টার এই দুর্ভিক্ষের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনঃসংযোগ করিয়া ব্যাপারটি অনুধাবন করেন। তারপর কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করিতে হইবে, ১৯৪৩ অব্দে কি ভাবে তাঁহারা দায়িত্ব পালন করিতে যাইতেছেন?

[সিদ্দিকি সাহেব বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন।]

আমি জানি, এই কাহিনী সিদ্দিকি সাহেবকে অতিশয় বিচলিত করিতেছে।

[সিদ্দিকি সাহেব বলিলেন, 'নিশ্চয়'।

কিন্তু এই পরিষদে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বাংলার হতভাগ্য অধিবাসীদের প্রতি অধিকতর দয়াবান ও সহানুভূতিশীল। দূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া সিদ্দিকি সাহেব অপরিমিত বিত্ত-সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, এই প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য এখনো যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র সহানুভূতি না হইয়া থাকে, তবে আমরাই তাঁহাকে করুণা করিব।

১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে হাণ্টার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে দেওয়া হইল—

১৭৭০ অব্দে সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরিয়া শ্বাসরোধী গরমের মধ্যে মানুষ মরিতে লাগিল। কৃষকেরা গোরু ও চাষের যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিল, বীজ-ধান খাইয়া ফেলিল, পুত্রকন্যা পর্যন্ত বেচিল। শেষে আর পুত্রকন্যা কিনিবারও লোক পাওয়া যায় না। লোকে গাছের পাতা এবং মাঠের ঘাস খাইতে লাগিল। ১৭৭০ অব্দে দরবারের রেসিডেণ্ট স্বীকার করিলেন, জীবিতেরা মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। দিন-রাত্রি অনশনক্লিষ্ট এবং রোগগ্রস্ত হতভাগ্যেরা স্রোতের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল।......মুমূর্ষু এবং মৃতদেহের স্তূপে রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল বন্ধ হইল। শবদেহের সৎকারও আর সম্ভব হইল না। এমন কি প্রকৃতির সম্মার্জক শিয়াল-কুকুরেও মৃতদেহ খাইয়া শেষ করিতে পারে না। বিকৃত এবং গলিত শবের স্তূপে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল।

মেকলে তৎকৃত লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতেও অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

যে সকল নিতান্ত কোমলাঙ্গী অন্তঃপুরিকা কখনও বাড়ির বাহিরে আসেন নাই, যাঁহাদের অবগুণ্ঠন কখনও লোকচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত হয় নাই, তাহারাও পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তান-সন্ততির জন্য একমুষ্টি চাউল পাইবার নিমিত্ত ভূলুণ্ঠিতা হইয়া উচ্চ বিলাপে পথিকদের করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিজেতা ইংরেজদের প্রমোদোদ্যান এবং অট্টালিকা-তোরণের অতি-নিকটে সহস্র সহস্র মৃতদেহ প্রতিদিন হুগলি-নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মৃত এবং মুমূর্ষুর জন্য কলিকাতার রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হইল। রুগ্ন ও দুর্বল দেহ লইয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকিল, আত্মীয়দের শবদেহের সৎকার করিবার অথবা গঙ্গাজলে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিবার উৎসাহ তাহাদের ছিল না। প্রকাশ্য দিবাভাগে শিয়াল এবং শকুনির দল মৃতদেহ ভক্ষণ করিত; তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও কাহারও হইত না।"

ইহা অতিরঞ্জিত কাহিনী নয়। আজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমরা অবিকল এইরূপ বিবরণই পাইতেছি। আজই আমি ছয়-সাত

খানা চিঠি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাইলাম, উপরের বর্ণিত অবস্থাই ঘটিতে শুরু হইয়াছে। পরিষদের কাছে আমি প্রশ্ন করিতে চাই, এই দুর্দৈবের প্রতিকার কি? বাংলার জীবন-প্রবাহ যদি অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, তবে আমরা কোথায় থাকিব, আমাদের দলই বা কোথায় থাকিবে?

এই মন্বন্তর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘটে নাই; যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ শাসনের জন্য দায়ী, তাঁহাদেরই অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী পরাধীনতার ফলে অধিবাসীরা আজ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মেকলে বলিয়াছেন, 'প্রাকৃতিক কারণ, নিঃসন্দেহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ, উহারই অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজশাসনের অব্যবস্থা' মেকলের কথাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রিটিশ ফ্যাক্টরির প্রত্যেকটি ভৃত্য তাহার প্রভুর সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল; প্রভুও কোম্পানির সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এইভাবে কলিকাতায় প্রচুর সম্পদ দ্রুত পুঞ্জীভূত হইল; আর সেই সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্গতির চরম অবস্থায় উপনীত হইল।

সুমহৎ বৃটিশ-শাসনের তখন ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা চলিতেছে। সেই শোকাবহ চিত্র মেকলের অপেক্ষা সুন্দরতর রূপে কেহই আঁকিতে পারেন নাই।

এদেশের লোক যথেচ্ছাচারের মধ্যে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এমন যথেচ্ছাচারিতা তাহারা আর দেখে নাই। কোম্পানির ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটিও সিরাজদ্দৌলার কটিদেশ অপেক্ষা স্থূলতর। মুসলমান-আমলে অন্তত একটি প্রতিকারের উপায় ছিল,

অমঙ্গল নিতান্ত দুঃসহ হইলে, 'জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়া গবর্নমেণ্ট বিচূর্ণ করিয়া দিত। কিন্তু এই গবর্নমেণ্টকে অপসারিত করার উপায় ছিল না। কোম্পানির সেই আমলকে মনুষ্য-চালিত গবর্নমেণ্ট না বলিয়া দুষ্ট অপদেবতার সহিত তুলনা করা সঙ্গত।

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল; ইহা সেই সময়ের চিত্র। আজ আমরা ১৯৪৩ অব্দে পৌছিয়াছি। কিন্তু নিজের দেশ ও জাতির সেবা করিবার পক্ষে এবং দেশবাসীকে রক্ষা করিবার পক্ষে আমাদের সামর্থ্য কি কিছুমাত্র বাড়িয়াছে? অধিবাসীদের বাঁচাইবার সর্বশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ব্রিটিশ-শাসকবর্গের উপর। তাঁহারা এই পরম দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া যাহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত জড়িত আছে কেবল সেই সকল লোককে খাওয়াইতে চাহিয়াছেন।

মিঃ ডেভিড হেনড্রি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আমরা পূর্ব-রণাঙ্গনের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছি। কি ভাবে এই যুদ্ধ জয় করা যাইবে? যদি বাংলা অনশনে থাকে, বাংলাদেশ যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ-জয়ের কি বেশি সুবিধা হইবে? মানুষের মনের সাহস এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি কি সে অবস্থায় অব্যাহত রাখা যাইবে? আজ যে আমরা এই দুঃখভোগ করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশের কি অপরাধ? কাহার দোষে ব্রহ্মের পতন ঘটিয়াছিল? কাহার দোষেই বা সিঙ্গাপুর হস্তচ্যুত হয়? বাংলা তাহার জন্য দায়ী নয়, তবে কেন বাংলার অধিবাসীরা দুঃখভোগ করিবে? ভারত-গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে অবিলম্বে আমাদিগকে খাদ্য-শস্যের সরবরাহ পাইতে হইবে।

[য়ুরোপীয় দলের মধ্য হইতে বলিতে শোনা গেল, "আপনার বন্ধু জোজোর কাছে যান না কেন?"]

য়ুরোপীয় দলের নিকট হইতে আমরা এই ধরণের কথাই প্রত্যাশা করি। সদস্য মহাশয় কি সত্য সত্যই বলিতে চান, চাউল ও খাদ্যের জন্য ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টের দিকে না তাকাইয়া তোজোর কাছে চাওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? হাউস অব কমন্স-এ এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য মিঃ আমেরিকে তিনি কি পরামর্শ-দান করিবেন? তিনি বলিতেছেন, তোজো আমাদের বন্ধু। কে যে আমাদের বন্ধু—ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহা বলিয়া দিবে। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আপনাদের সহিত সম্পর্কিত হইবার ১৭০ বৎসর পরেও বাংলাকে যদি এই প্রকার অনশনে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু নহেন।

ভারত-গবর্নমেণ্টের দায়িত্ব সম্পর্কে একটু আলোচনা করিব। হিসাবের অঙ্কের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। ১৯৪৩ অব্দে বাংলার জন্য দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার টন গম নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ শান্তির সময়ে বাংলার জন্য নির্দিষ্ট গমের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টন। অতএব বর্তমান গুরুতর জরুরি অবস্থার জন্য বাংলাকে কোন অতিরিক্ত গম দেওয়া হয় নাই। আবার ১৯৪৩ অব্দের জন্য নির্দিষ্ট এই গমের মধ্যে কি পরিমাণ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে? মাত্র পঞ্চাশ হাজার টনের কাছাকাছি অর্থাৎ যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার শতকরা পঁচিশ ভাগ। সুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছেন, চাউলের পরিবর্তে বাংলার অধিবাসীদের জোয়ার ভুট্টা ও বজরা খাইতে হইবে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলার জন্য উহা দুই লক্ষ টন নির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু পৌঁছিয়াছে মাত্র দশ হাজার টন। অতএব সুরাবর্দি সাহেবের ফাঁকা বক্তৃতা এবং বাজে প্রতিশ্রুতিতে কি লাভ হইবে? যদি অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আনা না যায় এবং ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে খাদ্যশস্য বাংলায় পাঠানো

না হয়, তাহা হইলে ভারত-সরকারের পক্ষেই বা মধ্যে মধ্যে ভ্রান্তি-জনক ইস্তাহার বাহির করিবার সার্থকতা কোথায় ? পরিষদের প্রত্যেক ভারতীয় সদস্যকেই এইজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলীকে এমন শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিমূলক হইতে হইবে, যেন ভারত-গবর্নমেণ্ট ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্ট অথবা বাংলা-গবর্নমেণ্টের আসল প্রভুগণ তাহাকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ না হন। ইংল্যাণ্ডে প্রধান-মন্ত্রীর নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠানো হউক যে, গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে; প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বাংলায় প্রেরণ না করিলে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহাকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গণ্য করা হউক; এ সম্পর্কে আর কোন জোড়াতালি চলিতে দেওয়া হইবে না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিতে যদি অসমর্থ হন তবে মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়া দায়িত্ব পরিহার করুন। তখন দেখিব, গবর্নর এবং তাঁহার কর্মচারি-বৃন্দের সাহায্যে দেশের শাসনকার্য কি ভাবে চলিতে পারে ? সুরাবর্দি সাহেব যদি ইহা করিতে পারেন—

[সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, তিনি এবিষয়ে একমত।]

আমি জানি, সুরাবর্দি সাহেবের চৈতন্যোদয় আরম্ভ হইয়াছে। সত্যই যদি তিনি একমত হন, তাহা হইলে দলগত আনুগত্য এবং দল-নেতৃত্ব তিনি পরিত্যাগ করুন। জাতি, সম্প্রদায় ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে তখন আমরা সমবেত দাবি উপস্থিত করিব এবং এই চরম-সঙ্কটের মুহূর্তে সকলে ঐক্যবদ্ধ হইব।*

---

* ১৮ই জুলাই, ১৯৪৩ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্মানুবাদ।

কে ?

আমি প্রস্তাব করি—

খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে বে-সামরিক সরবরাহ-সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন, পরিষদের মতে উহা একেবারে নৈরাশ্যজনক। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন এবং বাংলার অধিক শস্যোৎপাদন সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডলী যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না; ঐ নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। খাদ্য-পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়া প্রদেশের সর্বত্র যে শোচনীয় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, মন্ত্রি-মণ্ডলী কর্তৃক অনুসৃত নীতিই তাহার জন্য দায়ী। সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া সম্প্রতি তাঁহারা চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে আইন জারি করিয়াছেন, তাহার ফলে লোকের দুর্দশা বহু গুণ বাড়িয়াছে। মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করিতে এবং মনুষ্য-জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রিমণ্ডলী সভ্য-সরকারের পক্ষে অবশ্যপালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই।"

পরিষদের গত অধিবেশনে খাদ্য-পরিস্থিতির আলোচনার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। ইহা বর্তমানে বাংলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জীবন-মরণের দূরপ্রসারী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরবরাহ-সচিবের বিবৃতি আদৌ সন্তোষজনক নয়। ইহাতে দূরদৃষ্টির পরিচয় নাই, ইহা কেবল শূন্যগর্ভ বাক্যে পরিপূর্ণ। ফলের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বলা যায়, সরকারি খাদ্যনীতি একেবারে বিফল হইয়াছে। আমার প্রতি এবং অপর যাঁহারা লোকের দুর্দশা-লাঘবের

চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি সুরাবর্দি সাহেব যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই না। ঘৃণাই এই ঘৃণ্য আক্রমণের একমাত্র প্রত্যুত্তর। বিপুল অযোগ্যতা এবং অবিবেচনা হইতেই এরূপ আক্রমণের প্রবৃত্তি জন্মে। সুরাবর্দি সাহেব নিজের মন ও চরিত্রের আলোকেই অপরাপরমানুষ ও ঘটনাবলীর বিচার করিয়াছেন।

আজ আমরা দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। দুঃখ-দুর্গতির—বিশেষত যাহারা পল্লীঅঞ্চল হইতে আসিতেছে তাহাদের দুরবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি, এমন সময় আমার নাই। সে কাজ আর কেহ করিবেন। অনশন এবং অনশনজনিত রোগে মৃত্যুর হার অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে আত্মহত্যা করিতেছে,পুত্রকন্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, বেওয়ারিশ মৃতদেহ যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেছে—এইরূপ অসংখ্য মর্মান্তিক বিবরণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট আসিতেছে। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় পড়িয়া মানুষ মরিতেছে ; এ. আর. পি.র বেড খালি পড়িয়া থাকিতেও তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হয় নাই। গবর্নমেণ্ট সম্প্রতি কলিকাতায় হাসপাতাল খুলিয়াছেন ; কিন্তু বিভিন্ন মফস্বল-কেন্দ্রে আজিও ঐরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

গত সপ্তাহে আমি মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। লঙ্গরখানায় আহারের জন্য আসিয়া আমার সম্মুখেই দুইজনের মৃত্যু হইল। আহার্য-দর্শনে এক ব্যক্তি এতটা উত্তেজিত হয় যে, মুখে অন্ন পৌঁছিবার পূর্বেই লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে অপসারিত করিতে হয়। অভিযোগ আসিল, মেদিনীপুরের হাসপাতালে বেড খালি থাকিতেও লোকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। আমি সিভিল-সার্জন এবং

উপস্থিত লোকজনের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। শুনিলাম, মেদিনীপুর হাসপাতালে এ. আর. পি.-র জন্য চল্লিশটি বেড সব সময়েই রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম। এই বেড সাময়িকভাবেও ব্যবহার করিতে দিবার ক্ষমতা কালেক্টরের পর্যন্ত নাই; গবর্নমেণ্টের আদেশ আবশ্যক।

কাঁথিতে শিয়াল-কুকুরে যথেচ্ছ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। এইসব জন্তুকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এই ধরণের একটি ঘটনা কাঁথির অধিবাসী কয়েক ব্যক্তি আমার গোচরে আনয়ন করেন। যে কাহিনী শুনিলাম, তাহা ধারণার অতীত। কলিকাতায় নিরাশ্রয় ও অনশনক্লিষ্ট লোকদের অবস্থা যত হৃদয়-বিদারক হউক—মফস্বলের শহরে ও গ্রামে যাহা ঘটিতেছে, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কঙ্কালসার নর-নারী ও শিশুর দল জাতিবর্ণনির্বিশেষে আহারের অভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এরূপ অসংখ্য দৃশ্য আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভূমিহীন গৃহহীন দরিদ্র-শ্রেণীর দুর্গতির মাত্রা অবশ্য সর্বাধিক; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও যে সকল পরিবার সাধারণ সময়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন, আজ নিতান্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁহাদিগকে মৃত্যু-বরণ করিতে হইতেছে। ইঁহারা আমাদের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের মেরুদণ্ড। জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক যথার্থ সেবা চিরদিন ইঁহারাই করিয়া আসিয়াছেন। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ইঁহাদের রক্ষা করিতেই হইবে।

আগামী কয়েক মাসে বাংলার মৃত্যুর হার যে কত ভয়াবহ হইবে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যাহারা কোন প্রকারে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহারা এত জীবনীশক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কখনো তাহারা আর কার্যক্ষম হইতে পারিবে না।

পরিষদের গত অধিবেশনে আমি হাণ্টার-রচিত 'পল্লী-বাংলার কাহিনী' এবং মেকলে-রচিত 'লর্ড ক্লাইবের জীবনী' হইতে ১৭৭০ অব্দ ও তন্নিকটবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ধ্বংস ও মৃত্যু-বর্ণনা শুনাইয়াছিলাম। তাহার পরে ১৭০ বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হইয়াছে। আজ ১৯৪৩ অব্দেও বাংলার সমাজ ও জীবন-পরিবেশের পক্ষে হাণ্টার ও মেকলের মন্তব্যগুলি সমান ভাবে প্রযোজ্য।

ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ কর্ডন স্মিথকে একবার বাংলাদেশ পরিদর্শনের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। বাংলার দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে নাটকীয় অত্যুক্তি হইয়াছে, এইরূপ নির্মম সমালোচনা বাংলা দেশ স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া তারপর তিনি যেন করেন। বাংলার এই সঙ্কটে ভারতবর্ষের সকল অংশের বে-সরকারি লোকদের নিকট হইতে অজস্র সাহায্য পাওয়া গিয়াছে; অর্থ, আশ্রয়স্থান, খাদ্যশস্য এবং কর্মী দিয়া সাহায্য করিবার বহু প্রস্তাব আসিয়াছে। যে বিরাট সঙ্কটের আমরা সম্মুখীন হইয়াছি, এই সব সাহায্য তাহার তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত সন্দেহ নাই,—তবু বাংলার জন্য দেশব্যাপী এই সহানুভূতি প্রাদেশিক ব্যবধানের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির বাস্তবতা সকলের চক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি লক্ষ লক্ষ ক্লিষ্ট লোকের হৃদয়ে সাহস ও দৃঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে; ইহা জনমত জাগ্রত করিয়াছে, গবর্নমেণ্টকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের—এমন কি ভারতের বাহিরের দেশসমূহেরও মনোযোগ বাংলার দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি বরাবরই বলিতেছি, জনসাধারণের প্রত্যেক শ্রেণীকে—প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে দুর্গতদের দুঃখ-লাঘবের কার্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু অধিবাসীদের খাওয়াইবার, সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার এবং মানুষের জীবন যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব প্রধানত ন্যস্ত রহিয়াছে দেশের গবর্নমেণ্টের উপর। সরকারি নীতির বিস্তৃত সমালোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। উহা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার সম্ভাবিত কারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান একান্ত রূপে আবশ্যক। এই অনুসন্ধান দোষ ধরিবার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া পরিচালিত হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য হইবে, আপোষের দ্বারা অথবা জনমতের চাপ দিয়া শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করা।

গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযোগ, বাংলাদেশের ভিতরে এবং দেশের বাহির হইতে যে উপায়ে খাদ্যশস্য-সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমেই বেপরোয়া ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন, বাংলায় খাদ্যশস্যের অভাব নাই; শস্য মজুত করিবার ফলেই বর্তমান দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আজ ভুল ভাঙিয়া গিয়াছে। সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিতেছেন, খাদ্যশস্যের তীব্র অভাব রহিয়াছে। এ যাবত কাল তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন; ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ মাস কাল ভ্রান্ত-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

জুন মাসে যে খাদ্য-অভিযান হইয়াছিল, তাহার ফলে বাংলার পল্লী-অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য অন্যত্র চলিয়া যায়। অভিযানের ফল আজও প্রকাশিত হয় নাই; গবর্নমেণ্টের তাহা প্রকাশ করিবার সাহসই নাই। আমরা প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেকটি মহকুমার হিসাব জানিবার দাবি করিতেছি। গবর্নমেণ্টের মতে কোন্‌গুলি ঘাটতি অঞ্চল এবং কোন্‌গুলি উদ্বৃত্ত অঞ্চল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

খাদ্য-অভিযানের সময় এবং তাহার পরেও ব্যবসায়ী ও আড়তদার-দের যে-কোন মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে দিয়া গবর্নমেণ্ট মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। কি পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করা হইয়াছে, কোথায় তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং কোথায়ই বা তাহা রহিয়াছে, সে কথা আমরা জানিতে চাই। ঘাটতি অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। কোথাও কোথাও গুদাম আটক করিয়া সীল করা হইয়াছে। সেই সব জায়গাতেই লোকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তবু গুদামজাত মাল মজুত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রদেশের সর্বত্র হইতে আউশ ধান ক্রয়ের পরিকল্পনার ফলে পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ন্যায় অঞ্চল হইতেও ধান্য ক্রয় করিয়া অপসারিত করিতে গবর্নমেণ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন—ইহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। আজ সকালেই এক ভদ্রলোক কালনা হইতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, গত কয়েকদিন ইস্পাহানি-কোম্পানি গবর্নমেণ্টের এজেণ্ট রূপে কালনা অঞ্চল হইতে অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার মন চাউল কিনিয়াছেন। সকলেই জানেন, বিগত বন্যার ফলে এবং নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে কালনা অঞ্চলে লোকের কি নিদারুণ দুর্গতি হইয়াছে।

বাহির হইতে খাদ্য-আমদানি সম্পর্কে জানিতে পারা গেল, বাংলায় প্রেরিতব্য খাদ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ জুলাই মাসে ভারত-গবর্নমেণ্ট সংশোধন করিয়াছেন; পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বলিতে পারি না, পরিষদের কত জন সদস্য এ বিষয়ে অবগত আছেন। শোচনীয় সঙ্কট-সময়ে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী কেন সম্মত হইলেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর নাকি গত্যন্তর ছিল না, ভারত-সরকার এ বিষয়ে নাকি কোন কথাই শুনিতে রাজি ছিলেন না।

জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রিমণ্ডলী এই হ্রাস করিবার প্রস্তাবে কি জন্য প্রাণপণে বাধা দেন নাই? বাংলার সম্পর্কে যখন এইরূপ অবিচার করা হইল, তখন আত্মসমর্পণ না করিয়া তাঁহারা কেন পদত্যাগ করেন নাই?

[সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও হ্রাস করা হইয়াছে।]

সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন, বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর আপত্তি সত্ত্বেও শস্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে বাংলা দেশ জানিতে চাহিবে, মন্ত্রিমণ্ডলী আদৌ কেন এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন? কেন তাঁহারা বলেন নাই, 'বাংলার জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইলে আমরা পদত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিব'?

প্রদেশের বাহির হইতে যে খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা নির্ভুল হিসাব জানিতে চাই। বাংলার জন্য যে পরিমাণ শস্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি সমস্তই আসিয়া গিয়াছে? লাহোর হইতে ফিরিয়া সুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছিলেন, ফল খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু তিনি ফিরিবার মাত্র দুই দিন পরে পাঞ্জাবের একজন মন্ত্রী বিবৃতি দিলেন যে, বাংলা-সরকার পাঞ্জাব হইতে যে মূল্যে গম ক্রয় করিতেছেন তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে বাংলার অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীদের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছেন।

ইস্পাহানি-কোম্পানিকে বাংলা-সরকারের সোল-এজেণ্ট নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে আমি তদন্ত দাবি করায় সরবরাহ-সচিব আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জানাইবার জন্য আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি—

(১) ইস্পাহানি-কোম্পানিকে মোট যে টাকা দেওয়া হইয়াছে (অথবা অগ্রিম হিসাবে যাহা দেওয়া হইয়াছে), ঐ টাকা দিবার তারিখ ও উহার পরিমাণ।

(২) গবর্নমেণ্ট ও ইস্পাহানির মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার নকল।

(৩) বাংলা-গবর্নমেণ্টের পক্ষে বাংলার বাহিরে যে স্থান হইতে যে সকল লোক বা এজেন্টের দ্বারা যে তারিখে যে মূল্যে ইস্পাহানি-কোম্পানি খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়াছেন, তাহার বিবরণ।

সাড়ে চারি কোটির অধিক টাকা ইস্পাহানি-কোম্পানিকে দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা সুরাবর্দি সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে দেওয়া হয় নাই; বাংলার সরকারি তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের জানিবার অধিকার আছে, এই বিপুল অর্থের প্রত্যেকটি পাইয়ের হিসাবে যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না। মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত এই ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানটির রাজনীতিক সম্পর্কের কথা স্মরণ রাখিলে এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। আমরা বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে সংবাদ পাইয়াছি, বাংলা-গবর্নমেণ্টের নিকট ইস্পাহানি যে মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়াছেন, বহুক্ষেত্রেই তাহা যে সকল স্থান হইতে তাঁহারা চাউল কিনিয়াছেন, সেই সেই স্থানের প্রচলিত বাজার-দর অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন। ইহা দোষারোপ অথবা পাল্টা দোষারোপের কথা নয়। মন্ত্রীদের সুনামের যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমি যেসকল তথ্য জানিতে চাহিয়াছি, তাহার পূর্ণ-বিবরণ প্রদান করা তাঁহাদের উচিত হইবে। আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি, তাহা জনস্বার্থেরই পর্যায়ভুক্ত। অত্যন্ত

আপত্তিজনক উপায়ে কাজ-কারবার চালান হইয়াছে ; এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই উহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর একটি মারাত্মক ভ্রান্তি হইয়াছে, সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ জারি করা। গবর্নমেণ্ট পূর্বাহ্ণেই সমগ্র প্রদেশের হিসাব লইয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোথায় সঞ্চিত মাল রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের জানা উচিত। সরবরাহের ধারা শুষ্ক হইয়া গেলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ একেবারে অর্থহীন ; যদি সরবরাহ অব্যাহত থাকে তবেই মাত্র মূল্য-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপকার হইতে পারে। আজ সমগ্র শস্যসঞ্চয় অদৃশ্য হইয়াছে। যদি গবর্নমেণ্ট খোঁজ করিয়া উহা বাহির করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হিসাব-গ্রহণ একটা তামাসার ব্যাপার হইয়াছে ; বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমান সময়েও গবর্নমেণ্টের এজেণ্টগণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে এবং তদপেক্ষা অধিক মূল্যেও চাউল কিনিতেছেন। যে সকল অঞ্চলকে শস্যহীন অঞ্চল বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেখান হইতেও নিয়ন্ত্রিত ও তদূর্ধ্ব মূল্যে ক্রয় করা হইতেছে বলিয়া মফস্বল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। স্থানীয় কর্মচারিগণও প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেছেন, তীব্র অভাব বিদ্যমান থাকিতেও খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না বলিয়া কোন প্রকার সাহায্য-দান করা যাইতেছে না। বাংলার সমস্ত অঞ্চল হইতে ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে ; অসংখ্য লোককে অনশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। যদি অবিলম্বে ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ; সমস্ত প্রদেশকে অনন্ত দুর্গতির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রয়োজন মতো সরবরাহের দায়িত্ব না লইয়া গবর্নমেণ্ট যেখানেই

ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

শুধু চাউলের কথা বিবেচনা করিলেই চলিবে না—যে সকল অত্যাবশ্যক জিনিষের সরবরাহের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহার প্রায় সবগুলিরই অভাব ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চিনির কথা বলা যাইতে পারে। বর্তমানে চিনি সম্পূর্ণভাবে গবর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বাজারে চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রিত-মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কেন এরূপ হইয়াছে? চিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; বাংলার প্রাপ্য পরিমাণ সেখান হইতেই নির্ণীত হয়। বাংলার চিনি কেবলমাত্র বাংলা-সরকারের মনোনীত ব্যবসায়ীদের নিকট আসে। এই ব্যবসায়ীরা শুধু তাঁহাদের কাছেই চিনির সরবরাহ করেন, যাঁহারা বাংলা-সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স পাইয়াছেন। বাজারে অথবা অন্য কোথাও এমন কোন তৃতীয় পক্ষ নাই, যাহারা আসিয়া নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই প্রদেশে চিনির আমদানিকারকদের নির্বাচন দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই, রাজনীতিক এবং দলগত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। বিক্রয়ের জন্য যাঁহাদিগকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের বেলাতেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। একথা বলিতে চাই না যে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত সকলেই খারাপ লোক। কিন্তু বড় বড় আমদানিকারক এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ী—তাঁহাদের অনেকের নির্বাচনই দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া করা হয় নাই। মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সরবরাহের উৎসের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে,

তবু চোরাবাজার ও লাভের ব্যবসা অবাধে চলিতেছে ; তবুও বাজারে চিনি মিলিতেছে না।

কয়েকদিন পূর্বে এক ব্যবসায়ী ভারত-সরকারের একখানি আদেশ-পত্র আমাকে দেখান। তাঁহাকে সরিষার তৈল সরবরাহ করিতে বলা হইয়াছে। সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রিত-মূল্য প্রতি মন ৩৭৲ বা ৩৮৲ টাকা। ভারত-সরকার ৫০৲ টাকা মন দরে সরবরাহ চাহিয়াছেন।

[সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, সরিষার তৈলের উহাই নির্দিষ্ট মূল্য।]

সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন যে, বাংলা-সরকার পঞ্চাশ টাকাই মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাও মজার ব্যাপার। ভারত-গবর্নমেণ্ট সরিষার তৈলের মূল্য প্রতি মন ৩৮৲ টাকা স্থির করিয়া দিয়াছেন ; আর আমি নিজের চোখে তাঁহাদেরই আদেশ-পত্রে দেখিয়াছি, তাঁহারা পঞ্চাশ টাকা মূল্যে কিনিতে চাহিতেছেন। কাহারা তবে চোরা-বাজার সৃষ্টি করিতেছে, কাহারা অতি-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে? একদিকে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবস্থা, অপর দিকে ভারত-সরকারের নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ—ইহাদের হাত হইতে বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টকে রক্ষা করিবার উপায় কি?

বাংলায় বর্তমানে যে বণ্টন-ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্য-শস্য আসিতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। খাদ্যশস্য যদি সত্য সত্যই পৌছিয়া থাকে, সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সমভাবে তাহার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হওয়া উচিত। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের যোগ্যতা ও সততার উপর যে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, বর্তমান গবর্নমেণ্টের উপর তাহা আমাদের নাই। বাংলাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে, সরবরাহের উপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং যাহাদের

উপর সর্বসাধারণের বিশ্বাস আছে এমন লোকের দ্বারা বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত করা।

জন-কল্যাণের জন্য ব্যবসায়ী ও সর্বসাধারণকে আহ্বান করিতে হইবে, এবং গবর্নমেণ্টের উপর সর্বশ্রেণীর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন হইবে। সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে অনাচার ও কলুষ নির্মমভাবে দমন করিতে হইবে। যে সব অন্যায় ও দুর্নীতি চলিতেছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা বিদূরিত করিবার দায়িত্ব গবর্নমেণ্টের উপরই ন্যস্ত। অন্যায় ও দুর্নীতি দূর করিতে তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প—এই কথা মুখে বলিয়া যদি প্রকারান্তরে তাহাতে উৎসাহ দান করা হয়, তাহা হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা ভয়প্রদর্শন একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়ে।

বাংলায় নিদারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সর্বস্তরের লোকের সহযোগিতা ব্যতীত এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। গবর্নমেণ্টের পরিকল্পনাহীন শাসন-ব্যবস্থা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা শঙ্কাজনক। গবর্নমেণ্টের কার্য হইতে স্বতঃই মনে হয়, যাহা কিছু খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তাহা বৃহত্তর কলিকাতা-অঞ্চলের জন্যই রাখা হইবে, প্রদেশের অপরাপর অংশকে অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। মফস্বলে তীব্র অভাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছ চাউল ক্রয় করা হইতেছে—এই ব্যাপার হইতেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টন সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের কথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। খাদ্যের অভাবে লোক মরিতেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল স্থানেই সঞ্চিত খাদ্যশস্য পড়িয়া রহিয়াছে। বাংলার জনমত এ বিষয়ে অবিলম্বে জাগ্রত হউক। গবর্নমেণ্ট বরাবরই নিদারুণ অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ আমেরি

কি এখনও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, বাংলার লোক অতি-ভোজনের জন্যই কষ্ট পাইতেছে ; তাহাদের—বিশেষত লোভী কৃষকদের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ই এই অবস্থার জন্য দায়ী ? অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে কেন বাংলায় দ্রুত খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে না ?

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। আমন ধানের সম্পর্কেও যদি এইরূপ পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে সঙ্কট-মোচনের আর উপায় থাকিবে না। রোগ ও অনশনে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার এক শতাংশও যদি লণ্ডন অক্সফোর্ড বা এডিনবরার রাজপথে মরিত, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি মানুষ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যাইত ; মন্ত্রীদিগকে ক্ষমতার আসন হইতে সরাইয়া দিত। কিন্তু এখানে সংবাদ চাপিয়া রাখা হয়, অভিপ্রায় আরোপিত হয় ; যাহারা মন্ত্রীদের অযোগ্যতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে অথবা সমালোচনা করে, তাহাদের জন্য বন্দি-শালার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ঘরে-বাহিরে আমাকে এই বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে যে, খাদ্যকে আমি নাকি রাজনৈতিক কলহের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। য়ুরোপীয় দল এবং যাঁহারা আজ গবর্নমেণ্টের দলভুক্ত তাঁহাদের অনেকেই এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। খাদ্যসমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রাক্তন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য ইঁহারাই ছয় মাস পূর্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন কিন্তু ইঁহারাই বলিতেন, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য এবং জনস্বার্থের জন্যই ঐরূপ দল গড়া হইয়াছে।

আমরা কাহারও নিকট করুণার প্রার্থী নই। আজ আমাদের প্রধানতম কর্তব্য, বাংলা যাহাতে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। লোককে খাওয়াইয়া আপাতত বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায়-উদ্ভাবনে সরকার তিলার্ধ সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না।

খুব স্পষ্টভাবেই আমাদের কথা বলিতেছি। খাদ্যকে আমরা রাজনীতিক ক্রীড়াবস্তুতে পরিণত করিতে চাই না। সঙ্কট-মোচনের আমরা প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমরা মনে করি, বর্তমানের বিপজ্জনক অবস্থার জন্য গবর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত নীতিই দায়ী; সেই নীতির এবং গবর্নমেণ্টের সমালোচনা আমাদিগকে করিতেই হইবে। রাজনীতিক দাসত্বই আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। বাংলার উপর আজ যে প্রাণঘাতী আঘাত পতিত হইতেছে, সে আঘাত শুধু প্রকৃতির হাত হইতে আসে নাই। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে রহিয়াছে শাসন-ব্যবস্থার রাজনীতিক গলদ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী না হইতেছি, ততক্ষণ এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাই। কেন্দ্রে ও প্রদেশে যদি যথার্থ ক্ষমতাপন্ন ও দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ও বাংলায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হইতে পারিত।

কিন্তু আজিকার অতি-দুঃসময়ে আমি এই বৃহৎ সমস্যার কথা উত্থাপন করিতে চাই না। দলগত রাজনীতিক কলহের কথাও তুলিব না। আজ যে একটি দলবিশেষের গবর্নমেণ্ট বাংলায়

আধিপত্য করিতেছেন, তাহার দায়িত্ব আমাদের নয়। যদি এই গবর্ণমেণ্ট আমলাচক্রের অংশীভূত হইয়া থাকেন এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এই দলগত ব্যাপারে জড়িত হইয়া থাকেন, তাহার জন্যও আমরা দায়ী নই। আমরা অকুণ্ঠে বলিতে পারি, খাদ্য-পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হওয়ায় এই প্রদেশ শাসন করার নৈতিক অধিকার হইতে গবর্নমেণ্ট বঞ্চিত হইয়াছেন। গবর্নমেণ্ট এই অভিযোগ কখনও করিতে পারেন না, বিরোধী দল কেবল সমালোচনা করিয়াই কালহরণ করিতেছেন। বস্তুত আমাদের গঠনমূলক পরামর্শ পদে পদে উপেক্ষিত হইয়াছে। এখন এমন এক অবস্থা আসিয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট নিজেদের ভ্রান্ত-নীতি ও কর্মের জটিল জালে নিজেরাই জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

বিরোধী দল অকপটে সদিচ্ছা ও সেবার আগ্রহ লইয়া সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। গবর্নমেণ্টের নীতি এমনভাবে নির্ধারিত হউক যে, তাহা যেন সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। তাহা হইলে অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা যথাসাধ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু গবর্নমেণ্ট যদি তাঁহাদের বর্তমান ভেদ-নীতির অনুসরণ করিতে থাকেন এবং নিজেদের দায়িত্বে পরিকল্পনা তৈয়ারি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন,—তাহা হইলে আমরা বর্তমানের ন্যায় যখন সহযোগিতা যুক্তিযুক্ত মনে করিব তখন সহযোগিতা করিব, আবার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যখন বিরোধিতা শ্রেয় মনে করিব, তখন কঠোর বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিব না।

বর্তমান মুহূর্তের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে মিলন এবং মানসিক একত্ববোধ। যাঁহারা আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি

অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, এবং দেশের যাঁহারা প্রকৃত প্রভু তাঁহারা কেবল মুখের কথায় নয়—কাজের মধ্য দিয়া দেখাইয়া দেন বাংলাকে রক্ষা করিবার কার্যে অন্তত সাময়িকভাবেও গবর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত রাজনীতিক বিতর্ক স্থগিত রাখিয়া আমরা মিলিতভাবে এই প্রদেশের ধনসম্পদ ও জনসম্পদ একত্র করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। *

* ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ।

খোলা চিঠি

স্যর জন হার্বার্ট অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার জায়গায় বিহারের গবর্নর স্যর টমাস র‍্যাদারফোর্ড বাংলার গবর্নর হইয়া আসেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৩৪৩ তারিখে তাঁহাকে এই খোলা চিঠি দেওয়া হয়।

প্রিয় স্যর টমাস র‍্যাদারফোর্ড, বাংলার ইতিহাসের অতিশয় সঙ্কট-মুহূর্তে নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আপনি শাসক হইয়া আসিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিবাসীদের নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে সেবা করিবার অকপট আগ্রহ লইয়া সংস্কার-মুক্ত চিত্তে আপনি আসিয়াছেন, এই আশা করিয়া আপনাকে এই খোলা চিঠি লিখিতে সাহসী হইতেছি। সর্বপ্রথম আপনাকে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে হইবে; বাস্তব পটভূমিতে সমস্ত ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং সর্ববিধ বিভিন্ন মতামত শ্রবণ করিতে হইবে। নিজেকে আপনি আমলাচক্রের মুখপাত্র অথবা মন্ত্রীদিগের কার্যের নির্লিপ্ত দর্শক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।

আজিকার দিনে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন, দল-নির্বিশেষে সরকারি বেসরকারি এই প্রদেশের সমগ্র সম্পদ ও জনশক্তি সার্বজনীন সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। অতীতে যে সকল ভুল করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি যেন অবিলম্বে প্রত্যক্ষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন, এই জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

১। যাহাতে অভাব ও অনশনে লোকের প্রাণ ও স্বাস্থ্য-হানি না ঘটে, তজ্জন্য গবর্নমেণ্টকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপরই এযাবত অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রধানত তাহার ফলেই বর্তমান দুরবস্থা। গবর্নমেণ্ট প্রথম হইতেই সাধারণ লোকের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন নাই। বেসামরিক জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব, যুদ্ধকালে প্রদেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও নিরপত্তা একান্তভাবে আবশ্যক—তাহার জন্যও ইহা অপরিহার্য। ভবিষ্যতে যেন এ সম্পর্কে কোন অসতর্কতা না ঘটে।

২। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে নিয়মিত সরবরাহ পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত-সরকার বাংলার জন্য নির্দিষ্ট শস্যের পরিমাণ সম্প্রতি হ্রাস করিয়াছেন; উহা বাড়াইতে হইবে। গত ছয় মাস ধরিয়া আমরা এই কথা বলিয়া আসিতেছি, ভারতের বাহির হইতে বিশেষত অস্ট্রেলিয়া হইতে বাংলার খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা আজও কেন করা হয় নাই, বাংলা তাহা জানিতে চায়। যদি দেখা যায় অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি শস্য প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহা হইলে গত বৎসর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মধ্যবর্তিতায় গ্রীস যে ভাবে শস্য পাইয়াছিল বাংলার জন্য সেইভাবে চাউল পাইবার চেষ্টা করা উচিত।

৩। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হইবার পর পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ হইতে বাংলা-সরকার যে পদ্ধতিতে চাউল ক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় ত্রুটিযুক্ত। টেণ্ডার আহ্বান না করিয়া

মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্কিত কোন অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে এজন্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানকে আজ পর্যন্ত চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বাংলা-গবর্নমেণ্টের নিকট ন্যূনতম মূল্যে যাহাতে এই চাউল বিক্রয় করা হয়, তৎসম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি লওয়া হয় নাই, অথবা দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা এই ব্যাপারের তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, কাজ-কারবার যথাযথ উপায়ে এবং বাংলার অধিবাসীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইতেছে না। যদি নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হয় তবে আমরা দেখাইতে পারিব, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার প্রতি কি প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, —দেশবাসীর মঙ্গল বিবেচনা না করিয়া কি ভাবে দলের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণে তৎপর হইয়াছিলেন।

৪। বাংলা দেশের ভিতরে শস্য-সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। গত জুন মাসে বাংলায় যে বহু-বিঘোষিত খাদ্য-অভিযান হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কি ধারণা তাহা আপনাকে অবগত হইতে হইবে। অভিযানের ফলাফল আজিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা দাবি করিতেছি, অবিলম্বে উহা প্রকাশিত হউক। সরকারি হিসাব অনুসারে কোন্ অঞ্চলে ঘাটতি রহিয়াছে এবং কোন্ অঞ্চলেই বা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে আমাদের পক্ষে তাহা জানিবার উপায় নাই। ব্যবসায়ী এবং বড় বড় আড়তদারকে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অত্যধিক মূল্যে অবাধে চাউল কিনিতে দিয়া বাংলার সর্বাধিক ক্ষতি করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে যে শস্য সঞ্চিত ছিল, ইহার ফলে তাহা অপসারিত হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি নীতিই এইরূপ অবাধ-ক্রয়ে উৎসাহ দান করিয়াছে; ইহাতে বহু ব্যাপক দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই গবর্নমেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিলেন। নিয়ন্ত্রণ-প্রবর্তনের পূর্বে বড় বড় আড়তদার এবং ক্রেতাকে দেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া চাউল ও ধান কিনিবার জন্য এক সপ্তাহেরও অধিক সময় দেওয়া হইল। ইহার অপরিহার্য পরিণতি, চোরাবাজার ও ফাটকাবাজারের উদ্ভব। যেখানেই গবর্নমেণ্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, সেখানেই দুর্গতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। অস্বীকার করি না যে, ঘাটতি-অঞ্চলের অভাব পূরণ করিতে হইলে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ক্রয় না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু গবর্নমেণ্ট-ক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য বাজারে আসিলে, জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের জন্যও তাঁহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বর্তমান সরকারি ক্রয়-নীতির আমূল সংশোধন প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসে আমন ধান উঠিবার পূর্বে যদি ইহা সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের রক্ষার উপায় থাকিবে না।

৫। বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি। আমরা বিবেচনা করি, এই ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক সাম্প্রতিক ইস্তাহার অনুসারে স্থানীয় কর্মচারীরাই বণ্টনের এজেণ্ট-নির্বাচন করিবেন; নির্বাচনের সময় যে সকল বিষয়ের বিবেচনা করা হইবে, সম্প্রদায়গত বিবেচনাও তাহার অন্যতম। বণ্টনের নীতি-নির্ধারণের সময় সরকার যদি দলগত অথবা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। সরকার কি পরিমাণ শস্য কিনিয়াছেন অথবা জরুরি

প্রয়োজনে আটক করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই। যে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন। এই প্রদেশের সমর-বিভাগের সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ কি এবং রেলওয়ে ও বড় বড় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানগুলিই বা কত মাল মজুত রাখিয়াছেন? ভারত-সরকার ঘাটতি পূরণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া সঞ্চিত মালের একাংশ বেসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না?

৬। বাংলায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা আছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা নাই—এই কথা দায়িত্বশীল মন্ত্রিবর্গ গত কয়েক মাস যাবত ঘোষণা করিয়া যেভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন ও মানুষকে ধাপ্পা দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক পীড়াদায়ক। আমন ধান না উঠা পর্যন্ত প্রদেশের প্রয়োজন কতটা তাহা নির্ণয় করা, এবং ন্যায় ও বিচারসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই বর্তমান মুহূর্তে সর্বপ্রথম কর্তব্য। সরবরাহের পরিমাণ যখন সীমাবদ্ধ, তখন রেশনিং-এর ব্যবস্থা করাই প্রতিকারের উপায়। দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের জন্য লোকে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে সকলকেই স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থাই তাহার ভিত্তি-স্বরূপ হইবে।

৭। বাংলার অধিবাসীরা আজ যে দুর্গতি ভোগ করিতেছে তাহার শোচনীয়তা সম্পর্কে আমি আলোচনা করিতে চাই না। কলিকাতাতেই আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা যথেষ্ট মর্মান্তিক। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে যে সংবাদ আসিতেছে তাহা আরও ভয়ঙ্কর। এক সম্প্রদায়ের লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে—ইঁহারা দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহারা লঙ্গরখানায় আহার্য গ্রহণ করিতে

পারেন না, সরকারের নিকট হইতে দানও গ্রহণ করিতে পারেন না। ইঁহারাই বাংলার রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড। ইঁহারা যদি পিষ্ট ও দুর্বল হইয়া যান, তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ইঁহাদের দুর্দশা-লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে আমরা যে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল বেসরকারি প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন করা গবর্নমেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু যে বিরাট সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, বেসরকারি প্রচেষ্টা তাহার সামান্যই করিতে পারে। গবর্নমেণ্টকেই শেষ-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। বাংলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী দল-বিশেষের প্রতিনিধি; তাঁহাদের আবেদন সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সফল হইবে না।

এই মন্ত্রিমণ্ডলী যে অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশের বিশ্বাসভাজন নহেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার কার্যে ইঁহারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। এই পত্রে আমি দলগত প্রশ্ন তুলিতে চাই না, কিন্তু একটি কথা আপনাকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। খাদ্য-সঙ্কট মাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই সৃষ্ট হয় নাই, শাসন-ব্যবস্থার রাজনীতিক ত্রুটিও ইহার জন্য দায়ী। যে গবর্নমেণ্ট সমস্ত অধিবাসীর পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এবং যাঁহারা সরবরাহ ও মূল্যের পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণে সমর্থ, সেই গবর্নমেণ্টই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারেন। ভারতশাসন-আইন অনুসারে যে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, এই প্রকার গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহাদিগেরও পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে। যদি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় সরকার গঠন করা না যায়, বা ঐ প্রকার জাতীয় সরকারকে

বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ-সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আপনাকেই সমগ্র দায়িত্ব লইতে হইবে ; আপনিই নিজের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম লইয়া বাংলার অধিবাসীদের সম্মুখীন হইবেন। ব্রিটিশ-সরকার এখনও ভারতবাসীদের প্রভু বলিয়া দাবি করেন—অতএব সভ্য গবর্নমেণ্টের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য শাসকবর্গই অগ্রসর হইয়া আসুন।

(৮) পরিশেষে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্বতার শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে ; ইঁহাদের জীবনরক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে নিশ্চয়ই খাদ্য-সরবরাহের প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য-সংগ্রহই একমাত্র সমস্যা নহে। বাঙালী যাহাতে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুযোগ্য এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একদল লোককে গবর্নমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা লইয়া কাজ করিতে হইবে ; বাংলাকে অর্থনীতিক ক্ষয় ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য দূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমাদের এই যে উদ্বেগ, তাহার মধ্যে সমস্যার দূরপ্রসারী দিক্‌টা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। অধিক-খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সরকারি আন্দোলনটি বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিভাগের পুনর্গঠন ও ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি : একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই চারি লক্ষ একর জমি দামোদরের বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র জমিতে আমন ধান হইতে পারিত। কয়েক সপ্তাহ-পূর্বে এই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে ফিরিয়া এক বিবৃতিতে আমি বলি, অক্টোবরের শেষভাগে জল সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে

এই বিরাট ভূখণ্ডে যাহাতে যব গম কলাই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বীজ-বণ্টনের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় কৃষকেরা এই প্রকার সাহায্যের জন্য আমাদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট এই দিক হইতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত; প্রয়োজন হইলে আরও অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) এই পত্রে অন্যান্য সমস্যার বিশদ আলোচনা করিতে চাই না। শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করা, নিরাশ্রয়দের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা, হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর জেলায়—তাহাদিগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা, এইরূপ অনেক সমস্যা রহিয়াছে।

(১০) বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে; সেজন্য রাজনীতিক ব্যবস্থাও অপরিহার্য। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি সাহস করিয়া সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি-দান করুন। এই সঙ্কটসময়ে দেশের সেবা করিবার জন্য তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে, মুক্ত হইলে তাঁহারা ইহার সুযোগ পাইবেন। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বলিতে পারি, যদি এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে বাংলার আর্থিক এবং রাজনীতিক অবস্থার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইবে। আমাদের এবং আরও অনেকের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ভারতবর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক হইতে স্বাধীন না হইলে আমাদের সমস্যাসমূহের স্থানীয় সমাধান হইবে না। আপনার স্বদেশীয় নরনারী যে ধারণা পোষণ করিয়া গর্ব অনুভব করেন, আমরাও ঠিক সেই ধারণা পোষণ করি—যে, প্রাচ্যেই হউক

আর পাশ্চাত্যেই হউক, বৈদেশিক প্রভুত্ব সহ্য করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার বাস্তবতাকে আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না ; বাংলার অধিবাসীদের রক্ষা করিতেই হইবে। তাহারা যদি দারিদ্র্য ও অনশনে মরিয়া যায়, তাহা হইলে বাংলারও অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে।

(১১) কর্তব্য অতিশয় দুরূহ। গবর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ যদি সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়, তবেই ইহার সমাধান হইতে পারে। আজ অকপট সদিচ্ছা লইয়া বিরোধের অবসান ঘটাইবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষে যে শাসন-ব্যবস্থা চলিতেছে, সর্বোত্তম শাসকও উহার চক্রজালে পড়িয়া যাইতে পারেন। আপনি কি ভাবে কার্য-পরিচালনা করিবেন, কি ভাবে কঠোর কর্তব্য-পালনের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা জানি না। কিন্তু এই কথা বলিয়া আমি শেষ করিতে চাই, বাংলার অধিবাসীদের যথার্থভাবে আহ্বান করিবার সাহস ও রাজনীতিক দূরদৃষ্টি যদি আপনার থাকে, তাহা হইলে সকলেই সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিয়া বর্তমান সঙ্কটের সমাধান-চেষ্টায় সমবেত হইবে।

প্রতিকারের উপায়

সম্প্রতি বাংলায় যে দুর্দিন দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে স্বাভাবিক সময়েও ভারতবাসী দারিদ্র্য ও আংশিক অনশনের মধ্যে দিন যাপন করে। ইহার উপর আজ বাংলায় আরও বিষম সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে—যুদ্ধের সংঘাত ও গুরুতর রাজনীতিক দুর্দৈব।

পঞ্চাশের মন্বন্তর দৈব দুর্ঘটনা-প্রসূত নয়। বন্যা ও বাত্যার ফলে কয়েকটি জেলায় শস্যহানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সারা বাংলা জুড়িয়া যে নিদারুণ বীভৎসতা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অন্যবিধ। নিন্দাবাদ বা দোষ দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বৃটিশ-সরকার এখনও ভারতের প্রভুত্ব দাবি করেন; আমি চাই, তাঁহাদের উদ্যোগে একটি রয়্যাল-কমিশন গঠিত হউক। নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ঐ কমিশনের সদস্য হইয়া দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ অনুসন্ধান করিবেন। তখন ধরা পড়িবে, আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কত গলদ, কত অনাচার ও অযোগ্যতা। বৃটিশ-সরকারের যে প্রতিনিধিদের হাতে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতাও তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বোঝা যাইবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের শূন্যগর্ভতা। একদিকে মন্ত্রি-মণ্ডলী—তাঁহাদের দায়িত্ব আছে প্রচুর, কিন্তু ক্ষমতা নাই। অপর দিকে লাটসাহেব ও আমলাচক্র—তাঁহারা সর্বশক্তিমান, কিন্তু দায়িত্বের কোন বালাই নাই। বাদ-প্রতিবাদ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ অনেকই

হইয়াছে। যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানের ভার দিতে হইবে এমন সব সুযোগ্য ব্যক্তির উপর, যাঁহারা শ্রদ্ধার্হ, দেশবাসী যাঁহাদের উপর পূর্ণ আস্থাশীল।

বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে ভারতের প্রতি অঞ্চলে ধারণাতীত সাড়া জাগিয়াছে। সর্ব-শ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে স্বতঃ-উৎসারিত সাহায্য-ধারা আসিতেছে। বাঙালির হৃদয় ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু আমি বারম্বার বলিয়াছি, শুধু জনসাধারণের চেষ্টায় সঙ্কটের অবসান হইতে পারে না। গবর্নমেণ্টের সর্বপ্রধান কাজ, দেশাবাসীর খাদ্য যোগানো ; এই কর্তব্য পালনে গবর্নমেন্টকে বাধ্য করিতে হইবে।

আমাদের চেষ্টার ফলে অন্তত দুইটি কাজ হইয়াছে। প্রথমত, বাংলা ও অপরাপর প্রদেশে, এমন কি ভারতের বাহিরেও—জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। খবর চাপা দেওয়া এবং অবস্থা লঘু করিয়া দেখানোর যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু সত্য গোপন থাকে নাই। সমগ্র সভ্য-জগতের দৃষ্টি আজ বাংলার উপর পড়িয়াছে ; ভারতে বৃটিশ-শাসনের ফলাফল লইয়া দেশ-বিদেশে তিক্ত সমালোচনা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, এ যাবত সরকারি-প্রচেষ্টা অতি সামান্যই হইতেছিল। শুধু এই বুলি শুনিয়া আসিতেছিলাম, ঘরে ঘরে অজস্র খাদ্যসম্ভার গোপনে সঞ্চিত হইয়া আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য-চেষ্টায় মন্ত্রিমণ্ডলীর এখন সুর বদলাইয়াছে। লোভী ব্যবসাদার ও সঞ্চয়ী গৃহস্থের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আর দায় মিটিবে না ; সরকারের চোখ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশবাসীকে বাঁচাইবার প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদেরই। গবর্নমেণ্টের তরফ হইতে আজ অবধি খুব যে বেশি কাজ হইয়াছে তাহা নয়। তবে লাভ এই হইয়াছে, সারা বিশ্বের কাছে কর্তৃপক্ষকে

অবিরত জবাবদিহি করিতে হইতেছে। জনগণকে শাসন করিবার যাঁহারা দাবি রাখেন, জনগণের জীবন-রক্ষার দায়িত্ব হইতে তাঁহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবেন না।

বাংলার সমস্যা আজ বড় নিদারুণ। কেবল অন্নসত্র খুলিয়া ইহার সমাধান হইবে না। পল্লী-অঞ্চলে খাদ্য একেবারে অমিল। পেটের জ্বালায় ও দুর্দশার তাড়নায় মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে শহরে আসিতেছে। আশা, শহরে আসিলে খাদ্য পাইবে। মৃত ও মুমূর্ষুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবনীশক্তির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারেরাও আছেন। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে ইহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন।

মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ছন্নছাড়া হইয়া কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে, ঠিক নাই। গোষ্ঠিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রুগ্ন কঙ্কালসার শিশুগুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে; স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও তাহারা অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর অভাবে সকল চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার খাদ্য যদিই বা কোনপ্রকারে সংগৃহীত হয়, যানবাহনের অসুবিধায় উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দশজনকে লইয়া পরস্পরের সংযোগ-সূত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। যে কোন মূল্যেই চাউল কিনিতে হইবে—এই বেপরোয়া

নীতির ফল আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট স্বল্পতা রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে সরবরাহ ও বণ্টন—উভয়েরই পূর্ণ ভার লইতে হইবে; ঐ দুইটি ব্যাপার এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে খাদ্যের অভাবে কোন শ্রেণীর লোককেই উপবাস করিতে না হয়। কিন্তু ইহার জন্য চাই, এমন গবর্নমেণ্ট—যাহার উপর দেশের সর্বশ্রেণীর আস্থা আছে। গবর্নমেণ্টের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ অভিন্ন হইলে তবেই জাতীয় কল্যাণের এই নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বেই গবর্নমেণ্ট ও দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বাংলার মোট জন-সংখ্যার শতকরা সাত ভাগ মাত্র বাস করে। বাংলার গ্রামের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, উহা পাঁচ হাজার ইউনিয়ন-বোর্ডে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যাও প্রায় এক হাজার হইবে। এই বিরাট পল্লী-অঞ্চল আজ একেবারে চাউলশূন্য হইয়া গিয়াছে; গ্রামবাসী তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিতেছে। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ঐ পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ও এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রে অবিলম্বে চাউল আটা ও অপরাপর খাদ্যবস্তু পাঠাইতে হইবে। প্রতি কেন্দ্রে গড়ে অন্তত হাজার মন করিয়া পাঠাইয়া (কতকগুলি বড় শহরে বেশি পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে) গবর্নমেণ্ট অগৌণে কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। স্থানীয় সাহায্য এবং বাহির হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা অবিরত এই ব্যবস্থাকে পুষ্ট করিতে হইবে। প্রয়োজন মতো ক্রমশ আরও মাল-সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। রাষ্ট্র ও জন-সাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রকার ব্যাপক সাহায্য অবিলম্বে

যদি আরম্ভ না করা হয়, তবে পৌষ মাসে আমন ফসল উঠিলে তাহাও দেশবাসীর ভোগে আসিবে না। উহার সংগ্রহ ও বণ্টনে অব্যবস্থা চলিবে; দুর্ভিক্ষ দেশের মধ্যে স্থায়ী হইয়া রহিবে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সরকারি গুদাম থাকিবে; একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী উহার তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহচর্যে সাম্প্রদায়িকতা ও দলগত প্রশ্ন আদৌ আমলে না আনিয়া সাহায্য-ব্যবস্থা করিবেন। মানুষ আজ খাদ্যের প্রত্যাশায় ঘরবাড়ি ছাড়িতেছে, এই রকম ব্যবস্থায় তাহা নিবারিত হইতে পারে। দুর্গত গ্রামবাসীদের জন্য যে শস্যভাণ্ডার গঠিত হইবে, শস্যের পরিমাণ তাহাতে প্রয়োজনের অনুরূপ না হইলেও এইরূপ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইবে। ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার কাজে তাহারাই শেষে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষ বাংলার চিরাচরিত জীবন-রীতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে; মাত্র এই উপায়েই তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি বড় শহরের জন্য শস্যভাণ্ডার সম্পূর্ণ পৃথক রীতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামাঞ্চল অভুক্ত রাখিয়া শহর বাঁচাইয়া রাখা—ইহা যেন কখন ঘটিতে না পারে।

খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরকারি তরফ হইতে হয়তো দুইটি আপত্তি উঠিবে—প্রথম, মাল কোথায়? দ্বিতীয়, যানবাহনের উপায় কি? গবর্নমেণ্টের হাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য সঞ্চিত আছে, জনসাধারণকে তাহা কখন জানানো হয় না। গত দুই মাস ধরিয়া বাংলায় প্রচুর মাল আমদানি হইতেছে, কিন্তু 'ততঃ কিম্'—এ তথ্য আমাদের নিকট একেবারে রহস্যাচ্ছন্ন। যে কোন উপায়ে হউক, খাদ্যশস্য চাই-ই। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে—

ভারতের বাহির হইতেও সরকার অবিলম্বে আমদানির ব্যবস্থা করুন। যুদ্ধের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে বহু প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ-ছয় মাসের উপযুক্ত খাদ্য মজুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রেল-কোম্পানি পোর্ট-ট্রাস্ট কলকারখানার মালিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা আহ্বান করা হউক, তাঁহারা মজুত খাদ্যের কতক অংশ সাময়িক ভাবে ধার দিয়া জাতির প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করুন। শস্য-ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করা যাইবে, কিন্তু মানুষের প্রাণ গেলে আর ফিরিবে না। নূতন ফসল উঠিলেই এই ঋণ শোধ দেওয়া হইবে; ভারত-সরকার উহার দায়িত্ব লইবেন। গত আট মাস ধরিয়া আমরা বারম্বার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে বলিয়াছি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী, তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

পত্র-পত্রিকার মারফত শুনানো হইয়া থাকে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অজস্র খাদ্যসম্ভার মজুত করিয়া রাখিয়াছেন; সে সব দুর্ভাগ্য জাতি এখন অক্ষশক্তির অধীন, তাহারা মুক্তি লাভ করিলে ঐ খাদ্য দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান আমরা আজ বৃটিশ রাজত্বে বসবাস করিয়াও হাজারে হাজারে মারা যাইতেছি। ঐ সুবিপুল খাদ্যভাণ্ডারের কিছু অংশ কেন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না?

ক্যানবারা হইতে রয়টারের টেলিগ্রামে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) জানিতে পারি—

কৃষি ও বাণিজ্য-মন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম জোন্‌স্ স্কালে বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাহাজ যোগাইতে পারেন, একক অষ্ট্রেলিয়াই দুর্গত ভারতের যত গম দরকার—সমস্ত সরবরাহ করিতে পারেন। চালান দিবার জন্য গম মজুত হইয়া আছে, এখন জাহাজ পাইলেই হয়। জাহাজ মিলিবে কিনা, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নাই।

অস্টেলিয়া মাল পাঠাইবার জন্য তৈয়ারি হইয়াই আছে। আনুমানিক আশি হইতে একশ মিলিয়ান বুশেল গম অস্ট্রেলিয়ায় আছে; আবার কয়েক মাসের মধ্যে নূতন ফসল উঠিবে। অতএব ভারতেপাঠাইবার মতো প্রচুর গম রহিয়াছে।

মিঃ স্মালে কয়েক সপ্তাহ আগে একবার বলিয়াছেন, ভারতে পঞ্চাশ হাজার টন গম পাঠান হইয়াছে, জাহাজ পাইলে আরও পাঠান যাইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় আড়াই কোটি মন গম অস্ট্রেলিয়ায় মজুত আছে। ভারতবর্ষে গম পাঠাইবার জন্য তাহারা উদ্গ্রীব, অথচ জাহাজের ব্যবস্থা হইতেছে না। বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই বাংলার এই সঙ্কটের অবসান ঘটাইতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হইবে।

আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে, যানবাহনের অভাব—পল্লীতে পল্লীতে খাদ্য পৌঁছানো হইবে কি উপায়ে? কিন্তু এই আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিলে যানবাহনের অভাব হইবে না। পনের দিনের জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হউক। সমস্ত সাধারণ কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া রেল স্টিমার নৌকা মোটরভ্যান সামরিক ও বেসামরিক লরি এমন কি গরুর গাড়ি পর্যন্ত খাদ্য বহিবার কাজে লাগিয়া যাক। বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টের জন্য শস্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা—ইহার অধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য বর্তমান মুহূর্তে আর কি আছে? আজ যদি বাংলাদেশে শত্রুর আক্রমণ হইত, যানবাহনের অভাবে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতাম? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জাপানি অভিযানের চেয়ে কোন অংশে কম সাংঘাতিক নয়। এই ব্যাপারটিকেও যুদ্ধ-সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বাংলা আজ প্রায় অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছে; এখনও যদি তাহাকে বাঁচাইবার অকপট আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শ্রেণী-

নির্বিশেষে জনসাধারণ সাহায্যদানে কার্পণ্য করিবে না। প্রয়োজন হইতেছে উদ্যম দূরদর্শিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির।

প্রতিদিন—প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন পরম মূল্যবান। বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে দুঃখ দুর্গতি ও অভাবের অতিশয় শঙ্কাজনক বিবরণ পৌঁছিতেছে। এই নিদারুণ বিপদের দিনে জনহিত-প্রচেষ্টায় আমলা-চক্রের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের তুলনা নাই। আমাদের নামে দোষারোপ করা হয়, এই খাদ্যসঙ্কট ব্যাপারটিকে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছি। বাস্তবিক, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্যই তো ভারতবর্ষের এই অর্থনীতিক দুরবস্থা ; এবং সেই কারণেই বাংলা আজ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

খাদ্যকে আমরা কোনক্রমেই রাজনীতিক ক্রীড়াবস্তুতে পরিণত করিতে চাই না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, এই দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ শাসকবর্গের ত্রুটি ও নির্বুদ্ধিতা, তখন সে কথা ব্যক্ত করিয়া ভ্রান্তনীতি পরিবর্তনের দাবি করা কি ভারতীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে মহাপাতক হইয়াছে ?

ইংরেজ এই অবস্থায় পড়িলে ইংল্যাণ্ডে আজ কি ঘটিত ? অনাহার মহামারী ও মৃত্যুর তাড়নায় এমনি করিয়া যদি কাউন্টি হইতে কাউন্টিতে শহর হইতে শহরে দলে দলে নরনারী মরীয়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কঙ্কালসার নগ্নশিশুর আর্তনাদে লণ্ডনের রাজপথে যদি এমনি শ্মশানের ছায়া নামিত, হাইড-পার্ক হ্যাম্পস্টেড-হীথের উপর মলমূত্রে সিক্ত ভূমিশয্যায় শত শত শব পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে কি দশা হইত ডাউনিং স্ট্রীটের ? ক্যাবিনেট কতক্ষণ টিকিত ?

ভারতবর্ষের আজ কি অবস্থা ? যুদ্ধ-ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত দেশবাসীর অবস্থা মর্মান্তিক

হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ; অথচ এই দুর্গতির প্রতিবাদে একটি অঙ্গুলি তুলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেশপ্রেমিক সহস্র সহস্র নরনারী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। আর সকলের উপরে রহিয়াছে আমাদের অস্থিমজ্জাগত সনাতন অদৃষ্টবাদ—সকল দুঃখ-দুর্দশার জন্য আমরা দুরতিক্রম নিয়তিকে দায়ী করিয়া থাকি। মানুষই যে আমাদের জন্মগত অধিকার নিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই নির্মম সত্য ভুলিয়া যাই। রাজনৈতিক অধীনতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, চিত্তের ক্লৈব্য, বুদ্ধির জড়ত্ব—সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষকে আজ নূতন সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩

সংগ্রহ

টাউনহলে বক্তৃতা (৬ই জুন, ১৯৪৩)

মন্ত্রিমণ্ডলী সাতমাস ক্ষমতালাভ করিয়াছেন, তবু তাঁহারা খাদ্য-সমস্যা সমাধানের কোন সুসম্পূর্ণ নীতি আজও জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলেন না। ইহা দুঃখের বিষয়। বাংলার খাদ্য-শস্যের প্রকৃত অভাব নাই, বারম্বার এই তথ্যবিরোধী উক্তি করিয়া তাঁহারা সমধিক ক্ষতি করিয়াছেন। জনসাধারণকে ন্যূনতম খাদ্য যোগানো সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। বাংলা ও ভারতবর্ষের শোচনীয় দুর্ভাগ্য, এখানে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকারি খাদ্যনীতি নির্ধারিত হয় না। ভারতবাসী অনেকে শান্তির সময়েও সারা বৎসর আধপেটা খাইয়া থাকে। যাহারা যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, তাহাদের প্রয়োজনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বে-সামরিক অধিবাসীদিগের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রীরা অযৌক্তিক ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই ফলে পার্লামেণ্টে মিঃ আমেরি বলিতে পারিয়াছেন, শস্য মজুত করিবার ফলেই খাদ্য-সঙ্কট হইয়াছে। দোষটা এইভাবে গবর্নমেণ্টের কাঁধ হইতে দুর্গতদের কাঁধে চাপান হইল। কিছু পরিমাণে শস্য যে মজুত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে সকল বড় বড় আড়তদার ও মুনাফাকারি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা অত্যধিক মূল্যে খাদ্যশস্য কিনিয়া বাজার বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে, আগামী খাদ্য-অভিযান তাহাদের বিরুদ্ধে চলিবে না; মজুত শস্যের সন্ধানে পল্লী-অঞ্চলে চলিবে।

মজুত শস্যের পরিমাণ নির্ণয় নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনুসন্ধান হইবার পূর্বেই পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর মজুত মাল রহিয়াছে, অথবা এক সরকারি প্রচারপত্রে যেমন বলা হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকে দরিদ্রদিগকে পিষ্ট করিতেছে—এই প্রকার ধারণা লইয়া কাজ করিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। সঞ্চয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা চিকিৎসা ও ধর্ম-ব্যাপারে প্রতি পরিবারেরই যে-সব অত্যাবশ্যক ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। এখানে সেখানে দুই এক হাজার মন খাদ্যশস্য পাওয়া গেলেও তাহাতে সমস্যার কোন সমাধানই হইবে না। শস্য বিশেষ কিছুই মিলিবে বলিয়া মনে করি না; লোকের বিরক্তি বাড়িবে মাত্র। বিশ্বাসযোগ্য লোকের দ্বারা হিসাব-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। হিসাব-গ্রহণ সম্পূর্ণ না হইলে, মুনাফা করিবার উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করা হইয়াছে পূর্ণভাবে তাহা প্রমাণিত না হইলে—গৃহস্থদের স্বল্প-সঞ্চিত খাদ্যশস্য গ্রহণ করা অনুচিত হইবে।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী মিঃ জিন্না এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। যুদ্ধ ও গুরুতর খাদ্যসঙ্কট সত্ত্বেও তাঁহারা বাংলার বিভিন্ন অংশে পাকিস্তান সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহাদিগকেই কল্পিত-পাকিস্তানের বহিঃপ্রদেশে খাদ্য-সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। পাকিস্তানের অর্থ-নীতিক ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া মুসলিম-লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁহাদের ভেদ ও অনৈক্যসূচক কার্যাবলী হইতে বিরত হইবেন কি?

পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যের বাধা অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ ভয় পাইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা অতিশয় উচ্চ

মূল্যে তাহাদের খাদ্যশস্য আকর্ষণ করিয়া লইবে; দুর্ভিক্ষ তাহাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িবে। এই সকল অঞ্চল হইতে কিছু পরিমাণ সাহায্য আসিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী এ বিষয়ে এখনও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

পল্লী-অঞ্চলে এমন সব লোকের মধ্যে খাদ্য-অভিযান চলিবে যাহারা নিজেরাই অভাব ও দুর্গতি ভোগ করিতেছে। অথচ বড় বড় আড়তদার ও মুনাফাকারিদের প্রদেশের যে-কোন অঞ্চল হইতে যে-কোন মূল্যে অবাধে চাউল কিনিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থের উপকারার্থে প্রত্যেক অঞ্চলকে নাকি এই উপায়েই স্বাবলম্বী করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাংলার বাহির হইতে চাউল কেনা হইয়াছে; উহার পূর্ণ হিসাব পাওয়া প্রয়োজন। কি মূল্যে কাহাদের দ্বারা এই চাউল কেনা হইয়াছে? এই চাউল বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা যাহাতে অনুচিত লাভ না করে, তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? আমরা ইহার উত্তর চাই। যে সব ব্যবসায়ী বাংলার বাহির হইতে অল্পমূল্যে চাউল কিনিয়াছেন, গবর্নমেণ্ট কি তাঁহাদিগকে বেশি মূল্য দিয়াছেন? গবর্নমেণ্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য, আমদানি চাউলের উপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং দুর্গত-অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত-দোকানের মধ্যবর্তিতায় যাহাতে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ঐ চাউল বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

অধিক-খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনটি যাহাতে প্রসার লাভ করে তাহা সকলেরই কাম্য। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খবর আসিতেছে, লোকে আগামী ফসলের বীজ খাইয়া ফেলিয়াছে, বীজ পাওয়া যাইতেছে

না। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার যাহাতে না ঘটে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা গবর্নমেণ্টের উচিত। লোকে চাউলের পরিবর্তে যাহাতে অন্য খাদ্য খায়, গবর্নমেণ্ট সেই উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য চালাইতেছেন। অন্তত সেইসকল দ্রব্যের সরবরাহ সম্পর্কে গবর্নমেণ্টকে আশ্বাস দিতে হইবে; নতুবা প্রচারকার্য অর্থহীন হইবে। চাউলের পরিবর্তে আটা খাইতে বলা হইতেছে; গমের আমদানি তাহা হইলে বহুগুণ বাড়াইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বাইশ লক্ষ টন গম দিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাংলার আরও অন্তত দশ লক্ষ টন বেশি গম প্রয়োজন। যে গম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত বাংলায় পৌঁছিবে কিনা এবং অতিরিক্ত সরবরাহ পাওয়া যাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে সুস্পষ্ট উত্তর চাই। প্রয়োজন হইলে সমুদ্র-পার হইতে গম আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাভাবিক সময়েও দেশের শস্যে আমাদের প্রয়োজন মিটে না; এখন যুদ্ধ-ব্যাপারে এবং সমুদ্রপারের দেশসমূহে সরবরাহ করিতে গিয়া আমরা আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি।

ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের পরাজয় আমাদের দুর্গতির অন্যতম কারণ। ব্রহ্ম হইতে চাউল আসিতেছে না; এজন্য অপর কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলার খাদ্যসমস্যাকে মিত্রশক্তি সমর-প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। শাসকবর্গের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাংলার দুর্দৈব মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে অনুকূল হইবে না। এই প্রদেশে খাদ্যের অভাব নাই, লোকের অতি-সঞ্চয়ই বর্তমান সঙ্কটের কারণ—মন্ত্রিমণ্ডলী এই কথা ঘোষণা করিয়া সমস্যা জটিল করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপ ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রতারণা হইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হউন।

একটি কথা মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। খাদ্য-অভিযান চালাইতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—কিন্তু এই অভিযান যেন কোনক্রমে রাজনীতিক বা দলগত উদ্দেশ্য-সাধনে চালিত না হয়। বাংলার প্রত্যেক ইউনিয়নে মুসলিম-লীগের শাখা-গঠনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম-লীগ হইতে সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। আবার এদিকে প্রত্যেক দুইটি থানায় একটি করিয়া খাদ্য-কমিটী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। লীগের উপরোক্ত প্রচেষ্টার সহিত এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, বলিতে পারি না। খাদ্যকমিটীগুলি যাহাতে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হয়, যাহাতে কোনরূপ দলীয় বা সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে না পারে, দেশবাসীকে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করা মন্ত্রিমণ্ডলী প্রয়োজন মনে করেন নাই। বর্তমান সঙ্কট-সময়েও যাঁহারা শুধু দলগত স্বার্থ ও দলীয় আনুগত্যের কথাই ভাবিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যনীতি সম্পর্কে উৎসাহের সঞ্চার করা একেবারে অসম্ভব।

জনসাধারণ ও গবর্নমেণ্টের স্বার্থ যদি একীভূত না হয়, তবে খাদ্যসমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না। প্রকৃত তথ্য যাহাতে গোপন করা না হয়, এ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে; প্রয়োজন হইলে গবর্নমেণ্টের নীতি ও কার্যকলাপ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। উপযুক্ত সরবরাহ ও বণ্টন ব্যতীত এই সঙ্কটমোচনের উপায় নাই; তজ্জন্য যে রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক ব্যবস্থা আবশ্যক, মিলিতভাবে আমরা তাহার দাবি উপস্থিত করিব।

বিবৃতি (২৪শে আগস্ট, ১৯৪৩)

বর্ধমান এবং নদীয়ায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কোন কোন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া চারিদিন পরে আমি এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি। যে দৃশ্য দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্তসূত্র হইতে ধ্বংস দুর্গতি ও অনশনের যে সব সংবাদ পাইয়াছি, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। গবর্নমেণ্ট যে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি-সামান্য। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লোকের দুঃখ-লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আরও গুরুতর কথা, তাঁহারা খাদ্যশস্য সংগ্রহে সমর্থ হইতেছেন না। খাদ্যশস্য না পাইলে লোকের কিসে ক্ষুধা মিটিবে? অসংখ্য নরনারী অনশনে রহিয়াছে, বহু লোক মারা পড়িয়াছে, মানুষ সন্তানসন্ততি ও পোষ্যবর্গ বিক্রয় ও পরিত্যাগ করিতেছে। চারিদিকে অসহায় অবস্থা।

অনশন ও স্বল্পাহারে লোকের জীবনী-শক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে বাংলাদেশের সর্বনাশ হইবে। নিরাশ্রয় মানুষ ভিক্ষুকে পরিণত হইতেছে। আর এক শ্রেণীর লোকের জন্য কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না—ইঁহারা দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী। লঙ্গরখানায় আসিয়া আহার্য গ্রহণ করিতে পারেন না, ভিক্ষা করিতে পারেন না, একটিমাত্র পথ ইঁহাদের সামনে বিস্তৃত—অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বেসরকারি সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে; এইরূপ অনেক সমিতি আমি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা যেন সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কাজ করেন, আর দুইটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। প্রথমত, সরকারের তরফ হইতে যে সাহায্য-চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে

হইবে, যেন উহা জনস্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূলে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত স্থানীয় লোকজনের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব অর্থ ও জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে; স্থানীয় সম্পদ একত্র করিয়া সাহায্য-ব্যবস্থা ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, জনসাধারণের আহার্য জোগাইবার পূর্ণ দায়িত্ব গবর্নমেণ্টকেই লইতে হইবে; জনসাধারণ সাধ্যমত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। গবর্নমেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহা অতি সামান্য। অনেক আয়োজনেরই পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা নাই। নিম্নোক্ত পন্থায় যাহাতে গবর্নমেণ্ট নীতি-পরিচালনা করেন, তজ্জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবি উপস্থিত করিতে হইবে—

(১) যে সকল জেলায় তীব্র অন্নাভাব, এখনও তথা হইতে চাউল কিনিয়া অন্যত্র লওয়া হইতেছে। গত জুন মাসে খাদ্যের হিসাব গ্রহণের ফলাফল গবর্নমেণ্ট এখনও প্রকাশ করেন নাই। খাদ্য-অভিযানের সময়ে ঘাটতি অঞ্চল হইতেও চাউল অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বর্ধমানের ভয়াবহ বন্যার পরেও ঐ জেলা হইতে সহস্র সহস্র মন চাউল অপসারিত হইয়াছে। নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগর হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে লোকে অনাহারে মরিতেছে সেখান হইতেও অত্যধিক মূল্যে ধান-চাল কিনিয়া ধনী ব্যবসায়ী এবং মিলিটারি-কণ্ট্রাক্টরেরা অপসারিত করিতেছেন। এই সম্পর্কে আমার নিকট অনেক মর্মান্তিক অভিযোগ আসিয়াছে।

ঘোষণা করা হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট উদ্বৃত্ত আউশ ধান প্রকাশ্য বাজার হইতে কিনিবেন। ইহাতে সকলের মনে অবর্ণনীয় আতঙ্ক ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ হইলে বাংলায় যে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা অবস্থা দেখা দিবে, তাহা হইতে উদ্ধারের আশা

থাকিবে না। আমরা বরাবর বলিতেছি, গবর্নমেণ্ট খাদ্যশস্য কিনিবার প্রয়োজন মনে করিলে সকল শ্রেণীকে খাওয়াইবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তারপর উহা করিতে পারেন। কোন্ অঞ্চলে কতটা ঘাটতি বা কতটা উদ্বৃত্ত তৎসম্পর্কে গবর্নমেণ্টের হিসাব আমাদের জানা নাই। আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যদি জিদ করিয়া বেপরোয়া ক্রয়নীতি চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে অবস্থা অতি-ভয়ঙ্কর হইবে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে নরনারী দুর্গতির চরম অবস্থায় আসিয়াছে। ঐসকল অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(২) পশ্চিম-বাংলায় গবর্নমেণ্ট যে সকল লঙ্গরখানা খুলিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমাদের দাবি, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের প্রত্যেক গ্রামে এক অথবা একাধিক লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে। অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলেও প্রতি ইউনিয়নে অন্তত একটি হিসাবে লঙ্গর-খানা একান্ত আবশ্যক। ঐ সকল অঞ্চলে বেসরকারি সাহায্য-ব্যবস্থা হইতেছে; প্রস্তাবিত সরকারি ব্যবস্থা তদতিরিক্ত হইবে।

(৩) গৃহহীন নরনারীর কুড়েঘরগুলি পুনর্নির্মাণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয় নাই। যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য।

(৪) বেসরকারি সাহায্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত ভাবে গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে সস্তায় চাউলের সরবরাহ পাইতেছেন না। এই সামান্য সাহায্যটুকু যেন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পান। যে কাজ ইহারা করিতেছেন, আসলে তাহা গবর্নমেণ্টেরই করণীয়।

(৫) বহু মধ্যবিত্ত পরিবারকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইতেছে, তাঁহাদিগকে সাহায্য-দানের কোন ব্যবস্থা নাই। সাহায্য-ব্যবস্থা

করিয়া ইঁহাদের বাঁচাইতে হইবে। যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একদিকে কাজ শুরু করিয়াছেন, সস্তায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করিয়া গবর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

(৬) চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্যের জরুরি প্রয়োজন। ম্যালেরিয়া এবং পেটের পীড়ার জন্য ব্যাপক ভাবে চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্ত্র-বণ্টনের জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। বস্ত্রহীন অসংখ্য লোক—তাঁহাদের মধ্যে মেয়েরাও আছেন—লজ্জা-নিবারণের পন্থা ভাবিয়া পাইতেছেন না।

(৭) কৃষিঋণ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ হইবে লোকে তাহা জানে না। এই বিষয়ের সরকারি পরিকল্পনা জনসাধারণকে অবিলম্বে জানাইবার প্রয়োজন। এক বর্ধমান জেলাতেই তিন লক্ষ একর জমির আমন ধান বন্যায় নষ্ট হইয়াছে। এই জমিতে অবিলম্বে পুনরায় চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অক্টোবরের শেষের দিকে জল কমিয়া যাইবে। তখন গম যব ছোলা এবং কলাই উৎপাদনের জন্য যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমি খুব উর্বর; গম-চাষের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। এই বৃহৎ অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে। যদি অবিলম্বে সুব্যবস্থা না হয়, ছয় মাস পরে বর্ধমানকে অধিকতর মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। কৃষকদের বীজ-সংগ্রহে অসুবিধা হইতেছে, এজন্য সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবেন। গবর্নমেণ্টকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানাই, বীজ-সংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করিয়া দুর্গত জনসাধারণকে উহা যেন অবিলম্বে জানাইয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টের জন্য অতি-দ্রুত সুপ্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করাই আসল সমস্যা। গবর্নমেণ্ট জনসাধারণের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী, স্থায়ী সরকারি কর্মচারিবৃন্দ এবং ভারত-সরকার—আজিকার অবস্থার জন্য কাহার দায়িত্ব কতটা তাহা এখানে আলোচনা করিতে চাই না। চাউলের তীব্র অভাব উপস্থিত হইয়াছে। যে চাউল আছে, তাহা সকলশ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। যে অঞ্চলে অভাব রহিয়াছে, গবর্নমেণ্ট অবিলম্বে সেখান হইতে রপ্তানি বন্ধ করুন। জনসাধারণকে খাওয়াইবার দায়িত্ব না লইলে তাঁহাদের আদৌ চাউল কেনা উচিত নয়। বাংলায় যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, প্রতিদিন তাহা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। দেশের নরনারী সর্বপ্রকার সম্পদ—যত সামান্যই হউক না কেন—দুর্গতদের বাঁচাইবার জন্য সংগ্রহ করুন। জনমত উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। যাহাতে গবর্নমেণ্ট জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যসাধন করেন, নির্ভীকভাবে তাহার দাবি করিতে হইবে। এদেশের এবং ইংলণ্ডের গবর্নমেণ্ট উপলব্ধি করুন, অনশনক্লিষ্ট বাংলা তাঁহাদের নিজেদেরই স্বার্থের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে, বিশেষত বহির্ভারত হইতে—খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে।

দেশের শাসন-ব্যাপারে আমরা দেশবাসী ও শাসকবর্গের মধ্যে শোচনীয় স্বার্থ-বিরোধ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই স্বার্থ সম্পূর্ণ একীভূত করিয়া গবর্নমেণ্ট যদি সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জনকল্যাণের জন্য অগ্রসর হন, তাহা হইলে কেবল বর্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী জন-সাধারণের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শাসক, তাঁহারা থাকেন পর্দার

আড়ালে ; মন্ত্রিমণ্ডলী যদি সসম্মানে পদত্যাগ করিতেন, তবেই তাঁহারা লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইতেন। যাঁহারা বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের প্রকৃত প্রতিনিধি, ক্ষুৎপীড়িত দেশের প্রকাশ্য মঞ্চে উপস্থিত হইয়া জন-সাধারণের কাছে তাঁহারা যাহাতে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রেটব্রিটেনের অধিবাসীদের আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, গত কয়েক মাস ধরিয়া খাদ্যাভাবে আমরা যে দুঃখ-ভোগ করিতেছি তাঁহারা যদি ইহার সামান্য অংশও ভোগ করিতেন, তবে নিজের দেশের গবর্নমেণ্ট সম্পর্কে তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিতেন ?

বিবৃতি (৫ই নভেম্বর, ১৯৪৩)

গত আড়াই মাস যাবত বাংলার দুঃখ-লাঘবের জন্য আমরা প্রাণপাত প্রয়াস করিতেছি। ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহির হইতে যে সব মহানুভব দাতা টাকাকড়ি ও জিনিষপত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সুযোগে আর একবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিতেছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার কাজকর্মের সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। আজ পর্যন্ত নগদ ও জিনিষপত্রে বেঙ্গল রিলিফ কমিটী কুড়ি লক্ষ টাকা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা প্রায় চারি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন *। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী বাংলার কুড়িটি জেলায় একশ' পঁচিশটি কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রায় তিন লক্ষ নরনারীর সেবা করিতেছেন। অনেককে বিনা

* ইহার পর আরও অনেক টাকা উঠিয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা রিলিফ কমিটীর হিসাব পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

মূল্যে রান্না-করা খাবার দেওয়া হয় ; আবার বহুজনকে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ঔষধ ও বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাস অবধি এইভাবে কাজ চালাইতে হইলে যে কুড়ি লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার অনেক অধিক ব্যয় হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা কুড়িটি জেলায় একশ' পঁচিশটি কেন্দ্রে প্রতিদিন ষাট হাজারের বেশি লোকের সেবা করিতেছেন। বহু সাময়িক আশ্রয়-স্থান ও হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছে। বস্ত্র এবং ঔষধপত্রও বিতরিত হইতেছে। কুটির-শিল্পের প্রসারে আমরা বিশেষ ভাবে মনোযোগ দান করিয়াছি। সাহায্যের বিনিময়ে দুর্গতেরা যাহাতে কিছু কাজকর্ম করে, সাহায্য-কেন্দ্রগুলি হইতে এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। দুর্গত মধ্যবিত্ত পরিবারের সাহায্যের জন্য এ যাবত আমরা চল্লিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছি। রাজনীতিক বন্দী এবং টোলের পণ্ডিতদের পরিবারে এই টাকা হইতে সাহায্য করা হইয়াছে।

যে বিপুল কর্মভার গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার জন্য আরও প্রচুর অর্থের আবশ্যক। সর্বসাধারণকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানাইতেছি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভাকে আরও অর্থ-সাহায্য করুন। সেবাকার্যের বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে ; প্রত্যেক দাতার নিকট এই বিবরণ প্রেরিত হইবে।

আমরা এবং অপর বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বর্তমান সঙ্কটে যথাসাধ্য করিতেছি। কিন্তু সমস্যা এত বিরাট যে উহার সম্পূর্ণ সমাধান আমাদের ক্ষমতার অতীত। প্রয়োজনের তুলনায় আমরা সামান্যই করিতে পারিয়াছি। তবে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাংলার অবস্থা সম্পর্কে আজ যে সমগ্র ভারতবর্ষ ও বহির্জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে

উহা আমাদেরই চেষ্টায়। সরকারও অবশেষে এই সঙ্কটে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের কলঙ্কস্বরূপ। তদন্ত করিয়া ইহার কারণ উদ্ঘাটনের জন্ম আমরা পুনঃ পুনঃ দাবি করিয়াছি। দুঃখ-দুর্গতির ভয়াবহ কাহিনী ইতিমধ্যেই নিখিল-ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আর আমি নূতন করিয়া কিছু বলিতে চাই না। মৃত্যু-সংখ্যা অতি-দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। অহরহ অজস্র হৃদয়বিদারক বিবরণ আসিয়া পৌঁছিতেছে।

বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত নীতি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগ-সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথা পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি; এই সম্পর্কে অবিলম্বে সরকার ও জনসাধারণের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

(১) কলিকাতা হইতে নিঃস্ব ব্যক্তিদের অপসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পরিবার হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ না হওয়ায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। অপসারণের সময়ে বলপ্রয়োগও হইতেছে। যাহারা পড়িয়া রহিল, আত্মীয়-স্বজন হইতে তাহারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; পরিবারের আর সকলকে কোথায় লইয়া গেল, তাহা কোনক্রমে জানিবার উপায় থাকিতেছে না। আমি বহুবার বলিয়াছি, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিজ-গৃহে সমাজ-জীবনে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেককে তাহার বাসগ্রামের যথাসম্ভব নিকটবর্তী আশ্রয়-কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া উচিত। প্রতিক্ষেত্রেই খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইতেছে কিনা, দেশবাসীর তাহা জানা আবশ্যক।

সরকারকে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে ; বেসরকারী লোকদের মাঝে মাঝে আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে যাহারা বিতাড়িত হইতেছে, খাদ্যাভাবে যদি তাহারা মারা পড়ে, তাহাতে অবস্থা জটিলতর হইবে।

(২) একথা তিলার্ধ ভুলিলে চলিবে না যে খাদ্যের অভাবে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। এই রকম আরও কত লোক গ্রামে ও শহরে থাকিয়া অনাহারে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করিতেছে ! মাস খানেক পূর্বে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া এক একটি কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে; ঐরূপ প্রতি কেন্দ্রের জন্য শস্যভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি শহরের জন্যও অনুরূপ শস্যভাণ্ডার থাকিবে। ঐ সব ভাণ্ডার হইতে বিনামূল্যে অথবা সঙ্গত মূল্যে খাদ্যশস্য বন্টন করা হইবে। সে সব কিছুই হয় নাই। আমাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে কিনা, এ বিষয়ে আজ জনসাধারণের আস্থা শিথিল হইয়াছে। কেবল বিবৃতির পর বিবৃতি ও ইস্তাহার ছাড়িয়া এই আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। প্রতি অঞ্চলে শস্য মজুত করিয়া জনসাধারণকে চাক্ষুষ দেখাইতে হইবে ; ইহার ফলেই তাহাদের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিবে। তখন তাহারা জনরক্ষায় সর্বশক্তি-নিয়োগের অনুপ্রেরণা পাইবে। সরকারি হিসাবে প্রকাশ, গত সাত মাসে (এপ্রিল হইতে অক্টোবর) সরকারি খাতে বাংলাদেশে বাহির হইতে চারি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টনের অধিক খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও স্থানিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য মজুত করা হয় নাই। সঙ্কট ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সাত মাসের কথা হইতেছে, মনে রাখিতে হইবে ইহা বর্তমান মন্ত্রীদেরই আমল।

এই খাদ্যশস্য কোথায় কাহার কাছে প্রেরিত হইয়াছে, সরকারের নিকট হইতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উত্তর পাইতে চাই। গত তিন মাস কাল খাদ্য কোথায় চলিয়া যাইতেছে? কেবল জেলাগুলির নাম বলিয়া দিলে চলিবে না—কোন মহকুমা, কোন থানা, কোন ইউনিয়ন, এমন কি গ্রামেরও নাম জানিবার দাবি করি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানুষকে সত্যকার অবস্থা জানিতে দেওয়া হউক। ন্যায্য-বণ্টনের নীতি অনুসারে বিভিন্ন গ্রামকেন্দ্রে খাদ্য পাঠাইতে হইবে; বিনা পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খল ভাবে জেলায় বা মহকুমায় খাদ্য পাঠাইলে কিছুমাত্র ফল হইবে না। জাহাজ বোঝাই খাদ্যশস্য কলিকাতায় আসিতেছে, কিন্তু বণ্টন-ব্যবস্থা আগাগোড়া ত্রুটিপূর্ণ। সুচিন্তিত কার্যক্রম অনুসারে খাদ্যশস্য কেন বন্দর হইতেই গাড়ি-স্টিমার যোগে দ্রুত মফস্বলে পাঠান হয় না? কাপড় ও খাদ্যশস্য খালাস না হওয়ার দরুন কতদিন স্টিমারে পড়িয়াছিল, কতদিন পর্যন্ত সরকারি এজেন্ট ঐ সব জিনিষের ভার লইতে পারেন নাই? মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতির দাবি করিতেছি। অনেক ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ এজেন্ট কয়েক দিন ধরিয়া মাল খালাস করেন, পরে উহা সরকারের অনুগৃহীত মজুতদারের নিকট চালান যায়। ফলে দুর্গত অঞ্চলসমূহে মাল পৌঁছিতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায়। ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ সরকার কি বলিবেন? আমরা জানি, এই মজুতদারেরা কমিশন বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন। এই পক্ষপাতিত্ব ও অযোগ্যতা আর কত কাল প্রশ্রয় পাইয়া দুর্গত দেশবাসীর সর্বনাশ সাধন করিবে? আমরা দাবি করিতেছি, অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা তৈয়ারি হউক—যাহার ফলে প্রধান সাহায্যকেন্দ্রগুলিতে কাপড় ও খাদ্যশস্য পৌঁছিতে বিলম্ব না হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে

ঐ গুলি বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে অতি-দ্রুত বণ্টন করিতে হইবে। সর্বসাধারণের অবগতির ও পরীক্ষার জন্য প্রতি সপ্তাহেই কাজের পূর্ণ-বিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) পরবর্তী সমস্যা হইতেছে, সাহায্যের জন্য স্থানীয় সম্পদ যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা একত্রিত করা। গবর্নমেণ্টকে তাহা হইলে বর্তমান বেপরোয়া ক্রয়নীতি একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। আজিকার এই সঙ্কটে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন নষ্ট হইতেছে; বেপরোয়া ক্রয়-নীতি সঙ্কট-সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। খবর পাইতেছি, গবর্নমেণ্টের এজেণ্টরা এখনও তৎপরতার সহিত ক্রয় করিতেছেন। যেখানেই তাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন বা ক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে জিনিষপত্রের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট ক্রয় করিতে চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে বণ্টনের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন রকম গোঁজামিল চলিবে না। বর্ধমানের একটি দুর্গত অঞ্চলে গবর্নমেণ্ট লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাল আটক করিয়াছিলেন, কিন্তু অনশনক্লিষ্ট লোকদের মধ্যে উহা বণ্টনের অনুমতি দেন নাই। কয়েকদিন পূর্বে এই ব্যবসায়ীদের নিকট মৌখিক সরকারি আদেশ গিয়াছে, গবর্নমেণ্টের খাতে তাহাদের সমস্ত মাল ইস্পাহানি-কোম্পানির নিকট দিতে হইবে। অন্যান্য দুর্গত অঞ্চল হইতে—এমনকি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া হইতেও গবর্নমেণ্টের এজেণ্টরা অনুরূপ ভাবে চাউল কিনিতেছেন। লোকের অবস্থা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িতেছে।

(৪) সরকার আমন ধান কিনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্রয়-নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমন ধান এ বৎসর খুব ভাল হইয়াছে। শুধু এই ধানেই অবশ্য বাংলাদেশ

রক্ষা পাইবে না; তবে যথাযথ বণ্টন হইলে লোকের কষ্ট নিঃসন্দেহ হ্রাস পাইবে। আমরা সরকারকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমন ধান সম্পর্কে তাঁহাদের বর্তমান ক্রয়নীতি যেন অনুসৃত না হয়। অতীতে কয়েকটি অনুগৃহীত ব্যবসায়ীকে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে গিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে; আর যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রত্যেকটি গ্রামেই যেন বৎসরের উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্যশস্য থাকে, গ্রামবাসীদেরই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে, তাহাই কেবলমাত্র অপরের প্রয়োজনে লওয়া যাইতে পারে। লোকে নিজেরাই ইহা করুক—এজেন্টরা যেন বেপরোয়া কিনিতে না পারে, অথবা তথাকথিত উদ্বৃত্ত মাল লইয়া যেন টানাটানি শুরু না হয়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পস্থানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; বাংলার বাহির হইতে যে খাদ্যশস্য আমদানি হইবে, ভারত-সরকার তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলে সরবরাহের দায়িত্ব লইবেন। বৃহত্তর-কলিকাতার জন্য পৃথক ব্যবস্থা হইলে এবং গবর্নমেণ্ট ও ফাটকাবাজ ক্রেতারা মফস্বলের বাজার হইতে কিছুদিনের মতো সরিয়া দাঁড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কট বিদূরিত হইবে, দেশের স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিবে।

দেশের সর্বত্র মাল-চলাচল সম্পর্কে যাহাতে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বিত হয়, গবর্নমেণ্টকে এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের বাধ্য করিতে হইবে, যাহাতে মজুত মালের তাহারা সঠিক হিসাব দেয়। মুনাফা ও অতি-সঞ্চয়ের চেষ্টা দৃঢ়হস্তে বন্ধ করিতে হইবে। বৃহত্তর-কলিকাতাকে বাদ দিয়াও আমন ধানে সমগ্র বাংলার কতদিন চলিবে, তাহা বলা শক্ত; কিন্তু অবস্থা-পর্যবেক্ষণের জন্য এবং পুরা ১৯৪৪ অব্দ ও ভবিষ্যতের ব্যাপক খাদ্যনীতি নির্ধারণের জন্য সময় পাওয়া যাইবে। ইহা কম কথা নহে।

(৫) চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্য অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। কলেরা, আমাশয় ও ম্যালেরিয়া ব্যাপকরূপে দেখা দিয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ও বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভা হইতে এক লক্ষ লোকের মতো কলেরা-প্রতিষেধক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে ইহা অতি সামান্য। এক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগের অভাব রহিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই শোচনীয়। এ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের চেষ্টা অতিশয় মন্থর ও সীমাবদ্ধ।

আর একটি প্রধান আবশ্যক-দ্রব্য হইতেছে কাপড়। শীত আসিয়া পড়িল, এখন কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িবে। শিশুদের অবস্থা অতিশয় মর্মস্পর্শী; তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সুকল্পিত ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহাদিগের আশ্রয়-স্থান আবশ্যক; যতদিন স্বাভাবিক অবস্থা না আসে, ততদিন তাহাদের সেখানে রাখিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিতে হইবে।

অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। তবু আমি ঐকান্তিকতার সহিত বলিতেছি, এই দুর্দৈবকে এমন পন্থায় ফিরানো যাইতে পারে, যাহার ফলে আমাদের বাংলাভূমির আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নবরূপ পরিগ্রহ করিবে। সাধারণ বাঙালির অবস্থা স্বভাবতই অতি শোচনীয়; তাহার উপর মনুষ্যকৃত এই দুর্ভিক্ষের আঘাত বাঙালিকে নিষ্পিষ্ট করিয়া গিয়াছে। কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া আমাদিগকে সমবায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা একান্ত অবহিত হইব—

(ক) স্থানীয় ও বাহিরের অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন করিতে হইবে।

(খ) অধিক-খাদ্য উৎপাদনের আন্দোলন চালাইতে হইবে।

(গ) স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও শিক্ষা সম্পর্কিত পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সাবধানে একটি পূর্ণ কার্যক্রম তৈয়ারি করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ বাংলাদেশ দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। আজিকার সঙ্কট-মুহূর্তে সরকারি বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ ব্যর্থ হইবে, যদি না জনপ্রচেষ্টার সহিত সরকারি প্রচেষ্টার সংযোগ সাধিত হয়। দলগত রাজনীতির প্রশ্ন উত্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাংলাকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে হইলে রাজনীতিক দলাদলি একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এমন আবহাওয়াব সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের ঐক্যপ্রচেষ্টা বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে। মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তব্য-পালনে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাই তাঁহারা আজ সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়াছেন। জন-সাধারণ ও সরকারের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কি ভাবে এই ব্যবধান দূর করা যায়? বৃটিশ-সরকারের যে সকল প্রতিনিধি ক্ষমতা আঁকড়াইয়া আছেন, এই দারুণ সঙ্কট-সময়েও দমননীতি ত্যাগ করেন নাই, জনসাধারণকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—তাঁহাদিগকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। আজ বাংলায় যাহা ঘটিতেছে, তাহা বৃটিশ-গবর্নমেণ্টের তো বটেই—সম্মিলিত জাতিবর্গের পক্ষেও কলঙ্কের বিষয়। কারণ, পৃথিবী হইতে দুর্গতি ও অত্যাচার সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্যই নাকি তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন!

মন্বন্তর কি আবার আসিবে?

বাংলাদেশ সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে, অনেকের এইরূপ ধারণা। অবস্থা যাহাই হউক, এখন যে ধরণের সরকারি কর্তৃত্ব চলিতেছে, উহা চলিতে দিলে আবার বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। ঐ সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনীতিক সংস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ়-প্রযত্ন হইতে হইবে। একান্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন কোনক্রমে বর্তমান বর্ষের মতো খাদ্যসঙ্কট আর না ঘটিতে পারে। গত ছয় মাস কাল অন্নের অভাবে ধারণাতীত লোকক্ষয় হইয়াছে। যাহারা কোনক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রোগের কবলে পড়িতেছে। মানুষের জীবনী-শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই সর্বত্র রোগের প্রকোপ এমন ভয়ঙ্কর। ইহার উপর কাপড়-চোপড়ের অভাব, ঔষধ পাওয়া যায় না, পীড়িতের উপযুক্ত পথ্যাদিও একেবারে দুর্লভ। তাই দেশবাসীর দুর্গতির আর সীমা নাই।

লক্ষ লক্ষ পরিবার উপার্জন-ক্ষমতা হারাইয়াছে। চাউলের মন এখন যদি দশ বা আট টাকাতেও নামে, তবু লোকে ভরণপোষণ চালাইতে পারিবে না। দেশের সকল অঞ্চল হইতে দুঃখ-কষ্টের মর্মান্তিক বিবরণ আসিতেছে। দুর্গতদের মধ্যে অনেকে দৈহিক সামর্থ্য হারাইয়াছে; আবার সামর্থ্য থাকিলেও অনেকে কাজ জুটাইতে

পারিতেছে না। সকল বয়সের সকল সম্প্রদায়ের অসংখ্য নরনারীর এই শোচনীয় অবস্থা। আরও একদল আছে—ইহাদের মধ্যে নারী ও শিশুই অধিক—নিজ নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা শহরে ও গ্রামে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে; ধীরে ধীরে ইহারা পুরাপুরি ভিক্ষুক হইয়া যাইতেছে। সমাজের অর্থনীতিক বনিয়াদ চুরমার হইয়া গিয়াছে। শুধু সস্তা দামে খাদ্য-সরবরাহ করিলে হইবে না, সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দুঃস্থদের খাওয়াইয়া, এবং কাপড়-চোপড় টাকা-পয়সা দিয়া সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। পেটের দায়ে মানুষ ভিক্ষুক-বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে, একটা সমগ্র জাতির মধ্য হইতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

সকলের চেষ্টা-যত্ন ও সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু সাহায্য-পরিকল্পনা করিতে হইবে, স্থানিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে উহা প্রযুক্ত হইবে। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি দরিদ্রাবাস গড়িতে হইবে। যাহারা গৃহহীন ও একেবারে অশক্ত, ঐ সকল দরিদ্রাবাসে তাহাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হইবে। বাকি লোকের জন্য কাজের যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। শ্রম-মূল্যে তাহাদিগকে টাকাপয়সা ও খাদ্যাদি দেওয়া হইবে।

কারু ও শিল্পী-শ্রেণী একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের নিজ নিজ বৃত্তিতে সংস্থাপিত করিবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েও লক্ষ লক্ষ পরিবার আছেন—যাঁহারা উপার্জনহীন অবস্থায় অথবা যৎসামান্য আয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু-কবলিত হইতেছেন। এই মধ্যবিত্তেরাই বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক জীবনে সর্বাধিক দান করিয়াছেন। ইহাদের রক্ষা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

অর্থনীতিক সংস্থার উদ্ধার এবং সমাজ-জীবনে মানুষকে পুনঃসংস্থাপন—এই সম্পর্কে আর অবহেলা হইলে মন্বন্তর আবার প্রকট হইয়া উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাঁহারা ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, ১৯৪৩ অব্দে বাংলা যে সীমাহীন দুঃখভোগ করিয়াছে তাহার মূলে ছিল সরকারি কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। সত্য-গোপনের জন্য সরকারি তরফ হইতে প্রচুর চেষ্টা হইয়াছে। ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখাইতে আমেরি সাহেবের জুড়ি নাই। ইহা সত্ত্বেও বাংলার দুর্গতির বৃত্তান্ত সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এই ব্যাপারে সরকারি ইজ্জতও খুব ঘা খাইয়াছে।

বাংলার অগণ্য লোকক্ষয়ের জন্য বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কতটা দায়ী, সে আলোচনা আমি এখন করিতে চাই না। আশা করিতেছি, একদা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে। তখন সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ফজলুল হক সাহেবের যত ত্রুটি থাকুক, তাঁহার মন্ত্রিসভা ১৯৪৩ অব্দের মার্চ মাসে বিশ্ববাসীর সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, বাংলায় ভয়াবহ খাদ্য-সঙ্কট প্রত্যাসন্ন; বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে বাহির হইতে খাদ্য-সম্ভার আমদানি করিতে হইবে। ইহারই কয়েক সপ্তাহ পরে কোন কোন পদস্থ-মহলের ষড়যন্ত্রের ফলে ঐ মন্ত্রিসভা অপসারিত হইল। স্যর নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা-সময় হইতেই কয়েক মাস উপর্যুপরি অসত্য বিবৃতি দিতে লাগিলেন যে, বাংলায় খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা নাই; কতকগুলি লোক প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই ফলে এই সঙ্কট। মজুত খাদ্যশস্য বাহির করিবার জন্য জুন মাসে মন্ত্রিসভা খুব তোড়জোড় করিয়া খাদ্য-অভিযান করিলেন। এই

অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। মন্ত্রীরা অদ্যাপি অভিযানের ফলাফল প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই।

মন্ত্রিসভা অনুগৃহীত ব্যবসায়ীদের চাউল কিনিতে উৎসাহ দিলেন। ফলে গ্রাম-অঞ্চল একেবারে চাউল-শূন্য হইয়া গেল; মূল্যের স্বাভাবিক মান বিপর্যস্ত হইল; লোকে সরকারি ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থাশূন্য হইল। লণ্ডনে বসিয়া তখন আমেরি সাহেব বিবৃতির পর বিবৃতি দিতেছেন, বাংলার ভাল অবস্থা, কোনরকম গোলমাল নাই। আর বাংলাদেশে ও বহির্ভারতে যো-হুকুম দল ঐ ধ্বনিরই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, তাঁহারা ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিল হইতে অতি মূল্যবান সময়ের মারাত্মক অপব্যয় করিয়াছেন। ফজলুল হক সাহেব মার্চ মাসে চাউলের অভাবের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন; ইঁহারাও যদি ঐ পথ অনুসরণ করিতেন তবে বাংলায় এরূপ ভয়াবহ অবস্থা ঘটিতে পারিত না। সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা মুমূর্ষুদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কে গত দুই তিন মাস খুব কর্মিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। কেন এপ্রিল হইতে এই অধ্যবসায় শুরু হয় নাই? নূতন মন্ত্রীরা তখন নিজেরাই কেবল তালগোল পাকাইতেছিলেন, তাহা নয়—আসন্ন সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া যাহারা এসম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছিল, তাহাদিগকে পর্যন্ত দাবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বেসরকারি তরফ হইতে সাহায্য-প্রচেষ্টা না হইলে বাংলার দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পর্কে আরও দীর্ঘকাল বাহিরের লোক জানিতে পারিত না; বহু বিলম্বে সরকারি কর্তাদের টনক নড়িত।

এবার প্রচুর আমন ধান ফলিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বহুজনের ধারণা,

যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর বর্তমান অপকৃষ্ট শাসন-নীতি চালাইতে দেওয়া হয়, বাংলায় আবার মন্বন্তর দেখা দিবে। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্ট পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন, যাহাতে ১৯৪৩ অব্দের কলঙ্কিত দুর্দৈবের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে। অতএব তথাকথিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দোহাই পাড়িয়া এবার আমেরি সাহেব নিস্তার পাইবেন না। দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের যে দাম ছিল, এখন অবশ্য তাহার চেয়ে দাম কমিয়াছে। কিন্তু বাংলার সর্বত্র দাম আবার বাড়িয়াই চলিয়াছে; সরকার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশি দামে চাউল বিক্রি হইতেছে। এই জানুয়ারি মাসে চাউলের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও গবর্নমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত-মূল্য বজায় রাখিতে পারিতেছেন না—ইহাতে শাসন-ব্যবস্থার গলদ ও মন্ত্রিমণ্ডলীর চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যে কার্যক্রম অনুসৃত হইতেছে, উহা এলোমেলো এবং নিতান্তই দায়সারা গোছের। গণকল্যাণ এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে আস্থা-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে উহা প্রযুক্ত হইতেছে না।

গণচিত্তে আস্থা-সঞ্চারের জন্য এবং দেশব্যাপ্ত সঙ্কটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গত চারি মাস ধরিয়া আমি বলিয়া আসিতেছি, গবর্নমেণ্ট কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি শস্যভাণ্ডার খুলিবেন। চিরাচরিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখিতে হইবে। দুর্দিনের জন্য শস্য-সঞ্চয় রহিয়াছে, চোখের সামনে এইরূপ দেখিলে লোকের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিবে। বাংলার সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া এই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের সহিত জনসাধারণের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক। সকলের স্বার্থ সম্পূর্ণ একীভূত হইলে তবেই এরূপ কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু আজ অবধি

এরূপ কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বরঞ্চ কয়েকটি পেয়ারের ব্যবসাদার মারফতে যদৃচ্ছা চাউল কিনিয়া ঐক্য-চেষ্টা শ্লথ করা হইতেছে; সম-ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইহাতে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইতেছে। দুর্গত অঞ্চলে তৎপরতার সহিত খাদ্য-সরবরাহ করিবার জন্য প্রণালীবদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই। বাংলা আজ যে বিরাট সঙ্কটে মুহ্যমান, এইরূপ ব্যবস্থায় তাহার প্রতিকার হইতে পারে না।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে তিরিশ লক্ষেরও বেশি লোককে খাওয়াইবার ভার ভারত-গবর্নমেণ্ট লইয়াছেন। এই রেশনিং-এর বন্দোবস্ত করিতে গিয়াও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী গণ্ডগোল পাকাইতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য জনসেবা নয়—রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক যে দল তাঁহারা খাড়া করিয়াছেন, বর্তমান দুর্দৈবের সুযোগ লইয়া তাঁহারা ঐ দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চান। মন্ত্রিমণ্ডলীর মতলব ছিল, চলতি দোকান-পশার একেবারে উৎখাত করিয়া প্রসাদ-পুষ্ট সরকারি দোকান-গুলির মারফতে রেশনিং প্রবর্তিত করা। ভারত-গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের এই অযৌক্তিক কার্যক্রমের রদবদল করিয়াছেন। গ্রেগরি-রিপোর্ট ঐ কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কোন যুক্তির বলে জানি না—মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের দাবি বজায় রাখিবার জন্য বারম্বার জেদ দেখা-ইয়াছেন। ভারত-গবর্নমেণ্ট নির্দেশ দিয়াছেন, শতকরা পঞ্চান্নটি দোকান সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, এবং পয়তাল্লিশটি সাধারণ ব্যবসাদারদের হাতে থাকিবে। কিন্তু সরকারি দোকানে অনেক বেশি খরিদ্দার ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া ভারত-গবর্নমেণ্টের নির্দেশ প্রকারান্তরে ব্যাহত করা হইয়াছে। রেশনিং-ব্যবস্থাও যদি ন্যায়-নীতি অনুসারে না হইয়া এই প্রকার দলীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন করিব, খাদ্য-ব্যাপারে রাজনীতির আমদানি করিতেছে কাহারা?

কলিকাতায় হউক অথবা দূরতম পল্লী-অঞ্চলেই হউক—বাংলা-গবর্নমেণ্ট এবং বেসরকারি জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ নাই। ভারত-গবর্নমেণ্ট কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্প-অঞ্চলকে খাওয়াইবার ভার লইয়াছেন; বাংলার অপরাপর অংশে প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর ফসল ফলিয়াছে। এই অবস্থাতেও কেন লোকে এখনও দুঃখ-ভোগ করিবে? ১৯৪৪ অব্দেও বাংলাদেশে কেন খাদ্য-সঙ্কটের আশঙ্কা থাকিবে? মন্ত্রিমণ্ডলীর অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির জন্য যদি সত্য সত্যই এরূপ ঘটে, তবে উহার দায়িত্ব ভারত-গবর্নমেণ্টের উপর পড়িবে। একটি দলবিশেষের মন্ত্রিসভা—যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত—কখনই বৃহৎ জন-সমাজের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন না। যাঁহাদের বিরুদ্ধে বিচারভ্রষ্টতার এত নিদারুণ অভিযোগ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ জীবন লইয়া তাঁহাদিগকে ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া কখনই চলিবে না।

বাংলার লোক ভিক্ষা চায় না; বাঁচিয়া থাকিবার যে অধিকার মানুষের আছে, তাহারই দাবি করিতেছে। যে-কোন সভ্য নামধেয় গবর্নমেণ্টের ইহা প্রাথমিক কর্তব্য। লর্ড ওয়াভেল ও মিঃ কেসি নিরাসক্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বাংলার সমস্যা অনুধাবন করুন; এমন অবস্থার সৃজন করুন, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে স্বত-উৎসারিত সহযোগ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, রাজনীতিক বা সাম্প্র-দায়িক—কোন বিবেচনাই যেন গণ-মঙ্গলকে ছাপাইয়া না উঠিতে পারে। তবেই বাংলাদেশের সঙ্কট-মুক্তি ঘটিবে।

দিল্লি, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৪৪

ঐক্য চাই

মন্ত্রিমণ্ডলী গতবৎসর মূল্যবান সময়ের গর্হিত অপব্যয় করিয়াছিলেন। নহিলে সঙ্কট অত নিদারুণ হইত না। আজ ১৯৪৪ অব্দেও প্রায় সেই অবস্থা। যে সব বিবৃতি বাহির হইতেছে, তাহা গত বৎসরেই মতো আশ্বাসের ফাঁকা বুলি। উভয় বৎসরের বিবৃতিগুলি পাশাপাশি মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে।

মন্ত্রীরা চেষ্টা করিয়াছিলেন বাংলার সঙ্কট-বার্তা যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারে। বেসরকারি তরফ হইতেই প্রথম সাহায্য-চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন ও বিবৃতির অনেকগুলি ভারত-রক্ষা আইনের বেড়াজালে আটকাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থা গোপন রহিল না। জনমত জাগ্রত হইল। কতকগুলি সংবাদপত্র—বিশেষ করিয়া স্টেট্‌সম্যান—সঙ্কটের কথা সর্বজনগোচর করিতে লাগিলেন। এরূপ না হইলে আরও বহু বিলম্বে সরকারি কর্তাদের ঘুম ভাঙিত।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ও হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটী—এই দুইটি বেসরকারি সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা দুর্গতের সেবায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। উহার শতকরা নিরানব্বুই ভাগই অ-মুসলমানের দান। কিন্তু সাহায্য-কার্য জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হইয়াছে। আমার কাছে কাগজপত্র আছে,

তাহাতে নিঃসংশয়ে ইহা প্রমাণিত হইবে। গবর্নমেণ্টের তরফ হইতে কিন্তু গোপন সার্কুলার গিয়াছিল, তাঁহাদের সাহায্য-কমিটীগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে কেবল মুসলিম লীগেরই লোক লইতে হইবে। গবর্নমেণ্টের টাকা আসে সর্বশ্রেণীর নিকট হইতে। মুসলিম লীগ-দল আজ বাংলায় প্রভুত্ব করিতেছেন, কিন্তু টাকাটা লীগের নয়; মন্ত্রীদের নিজস্বও নয়। অথচ সাহায্য বিতরণ ও পরিচালনার ব্যাপারে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

বিগত বর্ষের এইসব তিক্ত ঘটনা অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। আজিকার প্রধান কর্তব্য, ১৯৪৪ অব্দে মন্বন্তরের যাহাতে পুনরাবির্ভাব না ঘটে, সর্বপ্রযত্নে তাহার উপায় নির্ধারণ করা। একদিক্ দিয়া অবশ্য পুনরাবির্ভাবের কথাই উঠে না; মন্বন্তর এখনও চলিতেছে। চাউলের দাম পূর্বে কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে? গবর্নমেণ্টের হিসাব মতোই প্রতি মন পনের ষোল টাকার কম নয়। ইহা তো দুর্ভিক্ষেরই অবস্থা।

খাদ্যনীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত দায়িত্ব মন্ত্রীদের। বর্তমান মন্ত্রীরা দল-বিশেষের প্রতিনিধি—সর্বসাধারণের নয়; ইঁহাদের কর্মিষ্ঠতা ও শাসন নীতির উপর সংখ্যাতীত দেশবাসীর অপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। জন-সাধারণের মনে আস্থার সঞ্চার না হইলে সঙ্কট-মোচন হইতে পারে না। বর্তমান মন্ত্রীদের দ্বারা উহা কোনক্রমে সম্ভব নয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস ২২শে মার্চ (১৯৪৪) তারিখে বগুড়ার খবর দিতেছেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য দুর্গতেরা আবার দলে দলে শহর মুখো ধাওয়া করিয়াছে। রংপুর রোডের উপর একটি মৃতদেহ কয়েক ঘণ্টা পড়িয়াছিল; স্টেশনের সামনের রাস্তায় দেখা গেল, আর একটাকে শিয়ালে-শকুনে খাইতেছে।

চট্টগ্রামে শতকরা পনের জনের মতো খাদ্যশস্য অনুমোদিত দোকানের মারফত সরবরাহ করা হইতেছে। চাউলের নিয়ন্ত্রিত-মূল্য সেখানে ষোল টাকা। হাজার হাজার লোকের ঐ দামে চাউল কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি নাই। আর, ইহাও কেবল শতকরা পনের জনের সম্পর্কে; বাকি পঁচাশি জনকে অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের চাউল কিনিতে হইতেছে বাইশ চব্বিশ টাকা দরে।

কলিকাতা গেজেটে (১৬।৩।৪৪) ৮ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সম্পর্কে বিবরণ বাহির হইয়াছে। ৮৯টি জেলা ও মহকুমার মধ্যে ২৯টির সম্বন্ধে সরকারি তরফ হইতেই স্বীকার করা হইতেছে যে, ঐ সব অঞ্চলে চোরা-বাজার চলিতেছে; বাজারের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে কোন খবরাখবর নাই। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের সর্বত্র এবং নিখিল পৃথিবীতে আমরা ঢাক পিটাইয়াছি, বাংলায় এবার প্রচুর ধান ফলিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এই মার্চ মাসেই দেশের লোকের এইরূপ অবস্থা। জনমত অগ্রাহ্য করা যায়, বিরুদ্ধবাদীদের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাহাতে মানুষ বাঁচানো যায় না। গত বৎসর ঠিক এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল; সমগ্র দেশ জুড়িয়া তাই এত বড় সর্বনাশ ঘটিয়া গেল।

বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বর্ধমান রেঞ্জের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে কিছুদিন আগে জানাইয়াছেন, চাউল ও খুচরা-মুদ্রার অবস্থা অবিকল গত বৎসরের মতো হইয়া উঠিয়াছে। চাউলের দাম চড়িতেছে, বাজার হইতে চাউল ও খুচরা-ভাঙানি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। পুলিশের লোকে গবর্নমেণ্টের স্টোর হইতে যে চাউল পাইতেছে, তাহা একেবারে অখাদ্য। চারি রকমের চাউল একত্র মিশানো, সঙ্গে প্রচুর পাথরের কুচি। উহা খাইয়া সকলে পেটের

পীড়ায় ভুগিতেছে। এইরূপ চাউল সরবরাহ হইতে থাকিলে পুলিশদল কাজের শক্তি হারাইবে।

সুরাবর্দি সাহেব বারম্বার বলিয়াছেন, বাংলায় খারাপ চাউল সরবরাহ হইয়াছে, ইহার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। নয়া-দিল্লির তাড়া খাইয়া সুরাবর্দি সাহেব তখন সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিলেন, উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্টের দোষেই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে। ২৪ মার্চ্চ (১৯৪৪) তারিখে উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্টের বিবৃতি বাহির হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের উপরেও মিথ্যা দোষারোপ হইয়াছে ; এই ব্যাপারে উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্টের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নাই। দোষ তবে কাহার ? অপকৃষ্ট চাউল আমদানির জন্য কাহাকে দায়ী করিতে হইবে ? সরবরাহ-সচিব কলিকাতায় বসিয়া এক কথা বলেন, আবার অন্যত্র গিয়া অপর এক প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের উপর দোষ চাপান। এইসব করিয়াই মন্ত্রিমণ্ডলী জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছেন।

আমরা অভিযোগ করিয়াছিলাম, হাজার হাজার মন ধান যশোহর স্টেশনে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। সুরাবর্দি সাহেব তখন বলেন, উপায় কি ? যানবাহনের জোগাড় হইতেছে না। দিল্লি হইতে স্যর এডওয়ার্ড বেন্থল ইহার জবাব দিয়াছেন। তিনি হিন্দু নহেন, মুসলমানও নহেন—বিরোধী পক্ষের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ নাই। তিনি বলিতেছেন, বাংলা-সরকারের নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারেই কেন্দ্রীয় সরকার যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে কার্যক্রম ইহারা পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে যশোহরের এই মজুত ধানের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপারে এইরূপ মর্মান্তিক অবহেলা করিয়া ইঁহারা সঙ্কট বাড়াইয়া তোলেন।

নিদারুণ দুঃসময়েও গবর্নমেণ্টের লাভের কারবার চলিয়াছে। অন্য প্রদেশ হইতে সস্তায় গম কিনিয়া বাংলার মুমূর্ষুদের কাছে উহা উচ্চ-মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। সুরাবর্দি সাহেব বলিতে চান, সে ব্যাপার তো চুকিয়া গিয়াছে—আবার কেন? কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি মিস্টার বি. আর. সেন কাউন্সিল অব স্টেটের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইদানীং কয়েক মাস ধরিয়াও ঐ কারবার চলিতেছে। সুরাবর্দি সাহেব ও মন্ত্রীরা অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু লোকের আর বিশ্বাস থাকিতেছে না।

আমরা ঐকান্তিক ভাবে চাই, বর্তমান বর্ষে যেন গত বৎসরের অবস্থা না ঘটে। গবর্নমেণ্টের সম্পর্কে জনসাধারণের নষ্ট আস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছি না। কেন্দ্রীয় পরিষদে এক অপরূপ প্রচেষ্টা দেখিলাম, জনস্বার্থের জন্য সেখানে মুসলিম লীগ-দল অন্যান্য দলের সহিত হাত মিলাইয়াছেন। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাংলার মুসলিম লীগ-দলও কি ঐরূপ সাহস ও দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিবেন? দলাদলি ভুলিয়া সকলে আজ ঐক্যবদ্ধ না হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, খাদ্য-সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান কোন ক্রমে সম্ভব হইবে না।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদে একদিন সুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছেন, আমি নাকি ইউরোপীয় দলের সাহায্য চাহিতে গিয়াছিলাম। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই জবাব দিতে পারি নাই। ইউরোপীয় দলের সহিত আমার ও অপর দুই বন্ধুর কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল। কোন দলীয় স্বার্থে আমরা তাঁহাদের সাহায্য চাহি নাই। বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্যেরা দুইটি দলে ভাগ হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রায় একশ জন আমরা বিরোধী দলভুক্ত। আরও দশজন

পরিশিষ্ট

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী

কমিটি নগদ ২৭,৪২,৩৬৩৷৵৪ পাই এবং নিম্নলিখিত জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন—

খাদ্যশস্য	৫৪,৪৪৭ মন ৫ সের	গেঞ্জি	৪,৫২৬ ডজন
ধুতি ও শাড়ি	৮,৭৩৭ জোড়া	ব্লাউস	৫৪টি
মার্কিন	২০০ থান	পুরানো কাপড়	২৭ গাঁইট
সুজনি	৭,১১৮ খানা	দুধ	১,৬৩২ পাউণ্ড
কম্বল	৩,৪৫০ খানা	বিস্কুট	১৩ থলিয়া

নিম্নলিখিত পরিমাণ জিনিষপত্র দিয়া কমিটি দুর্গতদের সাহায্য করিয়াছেন—

খাদ্যশস্য	১,৪৩,৮৬৩ মন ৫ সের	পুরানো কাপড়	৫৪ গাঁইট
ধুতি ও শাড়ি	১,৪৪,৮৭৪ খানা	দুধ	১,৬৩২ পাউণ্ড
মার্কিন	১,৭৭০ থান	বিস্কুট	১৩ থলিয়া
সুজনি	৭,১১৮ খানা	গুড়	২,২১৩ মন ১১৷৷০ সের
কম্বল	৬৮,৫৩৯ খানা	হাফ-প্যাণ্ট	২,৭৬০টি
গেঞ্জি	৬১,৬৯২ খানা	কামিজ	১০,০০০টি
	ব্লাউস	৪,৭৫৪টি	

দাতারা যে খাদ্যশস্য পাঠাইয়াছেন এবং কলিকাতায় যাহা কেনা হইয়াছে, উপরের হিসাবে মাত্র তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কমিটীর বিভিন্ন মফস্বল কেন্দ্রে বিতরণ ও কম দামে বিক্রয়ের জন্য বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য কেনা হইয়াছে। তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

কমিটী বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় করিয়াছেন—

খাদ্যশস্য-বিতরণ, কম দামে লোকসান করিয়া খাদ্যশস্য-বিক্রয় এবং দুগ্ধ বিতরণ	১১,১৯,৪৫৩৷৵৬ পাই	সংস্কৃত-পণ্ডিত ও ছাত্রদের সাহায্য (দাতার ইচ্ছাক্রমে)	৫৫,২৬৩৷৶৹ আনা
		পুনর্গঠন পরিকল্পনা	২০,৪০৭৵০ আনা

কাপড়	৪,১০,৮৩৪৶৹ আনা	কতকগুলি সেবা-সমিতিকে অর্থ-সাহায্য	১,৭০,৮৬৬৷৩ পাই
চিকিৎসা	১,১৯,৪০৬৷৶৯ পাই	যাতায়াতের গাড়িভাড়া, লোকজনের মাহিনা, প্রচার-ব্যয়, ডাকটিকিট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের খরচ ইত্যাদি	১২,৬৯৪৷৹ আনা
ছাত্রদের সাহায্য দান	৬,০০৩৷৹ আনা	মজুত	৭,৬৯,৭১৮।৶১০ পাই
শিশু-নিবাস	৩৬,১০৫৷৵৹ আনা		
কৃষকদের বীজ ও সার সরবরাহ	৫,১২২৷/৬ পাই		
ছাত্র-নিবাস	১৮,৪৬১৷৶৬ পাই		

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা রিলিফ কমিটী

কমিটী ২৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪) তারিখ পর্যন্ত মোট ৭,৬১,০৩৫৶৯ পাই সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যয় করিয়াছেন ৬,৩৮,১৩৬৸/৪ পাই। নিম্নের বিভিন্ন খাতে এই টাকা ব্যয় হইয়াছে—

খাদ্যশস্য-ক্রয়	২,৯৯,৬১২৶৹ আনা	সূতা ইত্যাদি ক্রয়	৯,৪৪০৲
কাপড় কম্বল প্রভৃতি ক্রয়	৬৪,২৪৭৵১০ পাই	সুদ ও ব্যাঙ্ক-খরচ	৯০৭৸৹
শিক্ষক, টোলের পণ্ডিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সাহায্য	১৯,৬৬৮৲	গুদাম ভাড়া	২৫০৲
ব্যক্তিগত সাহায্য	৭,৬৫০৲	পরিদর্শন প্রভৃতি বাবদ	২,৫০০৲
রাজবন্দীদের সাহায্য	৩৫,৭১২৷৶৹	বিভিন্ন সেবা-সমিতিকে সাহায্য	১,৭০,৯১৯/৬ পাই

৩১শে মার্চ (১৯৪৪) তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও ব্যয় করা হইয়াছে—

কেনা হইয়াছে—	১৩,৩৮৭ মন	(৫১৩৯ বস্তা)
সাহায্য হিসাবে পাওয়া গিয়াছে—	২২,২৮৯ মন	(৮৮৯১ বস্তা)
মোট	৩৫,৬৭৬ মন	(১৪০৩০ বস্তা)
বিলি হইয়াছে	৩২,৪৪৫ মন	(১২,৭৭৭ বস্তা)
মজুত	৩,২৩১ মন	(১,২৫৩ বস্তা)

শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর বিবৃতি

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর পরিদর্শন করিয়া আসিয়া ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩ তারিখে কুঞ্জরু মহাশয় যে বিবৃতি দেন, তাহার সারমর্ম। ভিন্ন প্রদেশের একজন নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার মন্বন্তর কি ভাবে দেখিয়াছেন, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সর্বত্রই দুরবস্থা এমন ভয়াবহ যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। শহর ও পল্লীঅঞ্চলে অনাহারে থাকাই ইদানীং লোকের ভাগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শহব অপেক্ষা পল্লীঅঞ্চলের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। গ্রামবাসীদের—বিশেষত নারী ও শিশুদের দুর্গতি দেখিয়া চোখে জল আসে। মাতাপিতা সন্তান ত্যাগ করিতেছে, স্বামী স্ত্রী ত্যাগ করিতেছে—এইরূপ ঘটনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সামান্ত-চাষী ও ভূমিহীন শ্রমিকেরা আহার্য কিনিবার জন্ত নাম মাত্র মূল্যে জমি ও ঘরবাড়ি বেচিতেছে। অনাহারক্লিষ্ট গ্রামবাসীরা ঘরের চালের টিন খুলিয়া বেচিতেছে, নারায়ণগঞ্জে এইরূপ দৃশ্ব দেখা গেল।

গৃহহীন এই সকল লোক সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় শহরে চলিয়া আসে, ও লঙ্গরখানায় ভিড় জমায়। কৃষকেরা চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে, এই অভিযোগ বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। গ্রামবাসী অনাহারে মরিয়া যাইতেছে; তাহাদের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত করিবার অভিযোগ আনা অতিশয় নিষ্ঠুরতার কার্য। আমি গ্রামের হাটে খুবই সামান্ত পরিমাণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এই চাউলের মূল্য কোথায়ও প্রতি মন পঞ্চাশ টাকার কম নয়। শহরে মূল্য আরও অনেক বেশি। চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ যখন ফলপ্রদ হইল না—আমার মনে হয়, ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিলে মফস্বলের বাজারে কিছু চাউল

আমদানি হইতে পারে। এই সম্পর্কে কেবল বেসরকারি লোক নয়—অনেক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গেও আমার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, ঐরূপ ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মিলিবে না।

ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক জায়গায় আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। যে সব লোক রাস্তায় পড়িয়া মারা যায়, তাহাদিগকে এখানে আনা হয়। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পেটের পীড়া ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত অনাহারক্লিষ্ট লোকের জন্য এমার্জেন্সি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। তবু পথের ধারে যেখানে সেখানে মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনাহারক্লিষ্ট নরনারীদের রাস্তার উপর চলন্ত শবের ন্যায় দেখায়। ইহারা শেষ পর্যন্ত যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তাহা দৈব ঘটনা মনে করিতে হইবে। আশ্রয়-স্থান ও এমার্জেন্সি হাসপাতালে যাহাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা বলা যায়।

কমন্স-সভায় মিঃ আমেরি বাংলাদেশে রোগের ব্যাপকতা ও ঔষধ-সরবরাহের অভাব একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঔষধের বিশেষ অভাব; কুইনাইন একরূপ অমিল বলিলেই চলে। নরনারী জীবনীশক্তি হারাইয়াছেন, সেজন্য রোগ দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সরকারি ও বেসরকারি লঙ্গরখানা হইতে প্রচুর সাহায্য-কার্য হইতেছে। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; খাদ্যবস্তুর অভাবে তাহাও আবার মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হইতেছে। এই সকল লঙ্গরখানায় জনপ্রতি দুই হইতে আড়াই ছটাক পরিমাণ খিচুড়ি দেওয়া হয়। প্রদত্ত খাদ্যের পরিমাণ সর্বত্রই অতি অল্প। ঢাকা সেণ্ট্রাল

রিলিফ কমিটী ঢাকা শহরে সরবরাহ-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন ; দায়রা জজ মিঃ দে কমিটির সভাপতি। শুনিতে পাইলাম, মহল্লা-কমিটীগুলি জনপিছু মাসিক বারো ছটাক চাউল ও কুড়ি ছটাক আটা প্রদান করিয়াছে। সর্বত্রই শুধু চাউল নয়—সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তুর অভাব। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সর্বাধিক বিপন্ন।

বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে আমার ধারণা ছিল, বাংলা-সরকারকে অসঙ্গত রূপে আক্রমণ করিবার জন্য রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবস্থার অতিরঞ্জিত বিবরণ দিতেছেন। কিন্তু এখন আমি দেখিতেছি, বাংলার নেতারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিটি বর্ণ সত্য ; ভারতবাসী ও বৃটিশ জনসাধারণের নিকট সত্য বিবরণ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা দেশের বড় কাজ করিয়াছেন। বস্ত্রের অভাবও খাদ্যের অভাবের তুল্য। কেবল ধুতি-শাড়ি নয়—এখন গরম-কাপড়েরও একান্ত প্রয়োজন।

মিঃ আমেরি বলিয়াছেন, সপ্তাহে প্রায় এক হাজার লোক মারা যাইতেছে। কিন্তু আমার ধারণা, মৃত্যু-সংখ্যা অনেক অধিক। একটি মহকুমা সম্পর্কে আমাকে বলা হয়, প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাতশত হইতে এক হাজার লোক মারা যাইতেছে। শহরেও মৃত্যুর হার অত্যধিক।

আমন ধান সম্পর্কে সরকার কি নীতি অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে লোকে বিশেষ উদ্বেগের মধ্যে আছে। তাহারা মনে করে, সরকার সমগ্র শস্য ক্রয় করিলে ফল শোচনীয় হইবে।

সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তাঁহারা কলিকাতাবাসীদেরই প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত ; মফস্বলের কথা তাঁহারা চিন্তাও করেন না।

অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অত্যধিক। লর্ড ওয়াভেলের কার্যকারিতার উপর বাংলার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।